আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক ১৯৪

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

১৯৪ তম সংখ্যা আগস্ট-সেপ্টেম্বর'১৭ জিলহজ্ব ১৪৩৮ হিজরী

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

www.sunnibarta.com

প্রচারে: গাউসুল আযম রেলওয়ে জামে মসজিদ

E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website : www.sunnibarta.com

দরসে হাদীস

হাশরের ময়দানের বিশেষ পুরস্কার

মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق، أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه،

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ পাক তাঁর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবেনা : ১. ন্যায়পরায়ন শাসক, ২. ওই যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে বেড়ে উঠেছে (তাঁর যৌবনকাল আল্লাহ্র ইবাদতে কেটেছে), ৩. ওই ব্যক্তি যার অন্তর সারাক্ষণ মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকে; একবার নামায পড়ে বের হয়ে পুণরায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত, ৪. ওই দু'ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালবাসে। তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই পরস্পর একত্রিত হয় আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়, ৫. ওই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্ কে স্মরণ করে আর তখন তাঁর চক্ষুযুগল অশ্রুসজল হয়ে যায়, ৬. ওই ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমণী আহবান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহ্ কে ভয় করি, ৭. ওই ব্যক্তি, যে এমনভাবে গোপনে আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে যে, তার বাম হাত জনে না, তার ডান হাত কী দান করল। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ, মিশকাত: পৃষ্ঠা. ৬৮)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একটি সুস্থ সমাজ, শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র সবারই কাম্য। একজন রাষ্ট্রনায়ক কিংবা সমাজপতি যতক্ষন ন্যায়-নীতিবান হবে না, ততক্ষণ সে ক্ষেত্রে কোন ধরনের কল্যাণ আশা করা অরণ্যে রোদন মাত্র। যুব সমাজের নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণে আজকের বিশ্ব জর্জরিত, কলুষিত। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কেন্দ্র হতে শুরু করে রান্নাঘর পর্যন্ত যখন দুর্নীতি, অবাধ্যতা ও অবিচারের কলুষতায় ছেয়ে যায় তখন মুক্তির আশা করা বৃথা বৈ-কি! অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয় প্রতিটি নাগরিক কোন না কোনভাবে। আজকের বিশ্বে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায়, কোথাও কেউ সুখে নেই। এক ধরনের অপ্রাপ্তি আর অস্থিরতা জেঁকে বসেছে সবার মস্তিষ্কে। আর তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে তাদের জীবনিশক্তি। তাই সবাই হন্যে হয়ে ছুটছে সে প্রশান্তির অন্বেষনে, মন্ত্র-তন্ত্রের পাতায় পাতায় চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এতটুকু শান্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ শান্তির নীড় আমাদের ঘরে। আমরা মুসলমানরা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ জাতি আর বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা হলেন আমাদেরই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ব্যক্তি থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ রাষ্ট্র পর্যন্ত তিনি মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান এবং পথচলার দিকর্নিদেশনা দিয়ে গেছেন আমাদের অত্যন্ত সুনিপূনভাবে।

আলোচ্য হাদীস শরীফে এই ধরণের একটি গাইড লাইন। হাদীস শরীফে উল্লেখিত সাতটি গুণে গুনান্বিত হয়ে মানুষ তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারে। তাহলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সব কঠিন হয়ে উঠবে উন্নত, সমৃদ্ধশালী ও সুস্থ।

এক. ন্যায়পরায়ন শাসক ঃ একজন রাষ্ট্রপ্রধান যদি ন্যায়পরায়ন হন তাহলে ওই রাষ্ট্রে কোন অবস্থাতেই দুর্নীতি থাকতে পারে না, চলতে পারেনা কোন ধরনের স্বজনপ্রীতি আর অবিচার। কর্মচারী, কর্মকর্তা সবার মন মানসিকতায় আসবে বিরাট পরিবর্তন। ফাঁকিবাজির কোন অবকাশ থাকবেনা। ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ধারা হবে দ্রুত গতিশীল।

www.sunnibarta.com

মূলতঃ একজন সুশাসক চাইলে তাঁর দক্ষ পরিচালনা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের পরিবর্তন আনতে সক্ষম। কবির ভাষায়-

যুগ যমানা পাল্টে দিতে চাইনা অনেকজন
একটি মানুষই আনতে পারে জাতির জাগরণ।

অবশ্য তাকে হাতে হবে মুত্তাকী তথা খোদাভীরু।

পবিত্র কুরআন ইরশাদ হয়েছে-

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

অর্থাৎ- তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর, কারণ এটাই তাক্বওয়ার নিকটতম পন্থা।

পবিত্র হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته،

অর্থাৎ- তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর সেই দায়িত্বের জবাবদিহিতা তাকেই করতে হবে। [বুখারী]

সুতারাং, বাদশাহ শাসক ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে সর্বোচ্চ পুরস্কার পারলৌকিক শান্তি তথা বেহেস্ত এবং হাশরের ময়দানে প্রচন্ড গরমে অতিষ্ট হয়ে যে দিন মানুষ দিক-বিদিক ছুটাছুটি করবে, সে দিন কোন ধরনের ছায়া থাকবে না আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া ব্যতীত। সেদিন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ওই ছায়ায় আশ্রয় পাবেন।

দুই. ওই যুবক আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে যার যৌবনকাল কেটেছে। আমরা জানি মানুষের জীবনে সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বিভ্রান্তির বেড়াজালে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সমূহ আশংকা থাকে এ সময়টাতে। ইবলিস শয়তান ওঠে পড়ে লেগে থাকে তাকে পদচ্যুত করার জন্য। সবদিক বিবেচনায় একজন যুবক নিজেদের রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করে সফলতার পানে এগিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। এমনকি হাদীস শরীফে একে বড় জিহাদ বলা হয়েছে। সুতরাং যৌবন কালের ইবাদত মহান আল্লাহ্‌র নিকট বেশী পছন্দনীয়। তাই তাদের পুরস্কার স্বরূপ হাশরের ময়দানে আরশের ছায়ায় তাদেরকে শামিল করা হবে।

তিন. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সারাক্ষণ মসজিদের পানে লেগে থাকে। হাদীস শরীফের ভাষায় মহান আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে প্রিয় জায়গা হল মসজিদ। আর সব চাইতে নিকৃষ্ট জায়গা হল বাজার। হাট-বাজারে বর্তমানে নানা ধরনের আড্ডা এবং যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। সে আশঙ্কাময় স্থান থেকে বিমূখ হয়ে যখন যুব সমাজ মসজিদমুখী হয়ে উঠে তখন তাদের মন মানসিকতাও খোদাভীরুতায় ভরপুর হয়ে যায়। অধিকন্তু মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে নিয়মতান্ত্রিকতা শিক্ষা দেয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী নিষ্পাপ শিশুর মত দিনাতিপাত করে থাকেন। মিথ্যা, জুলুম, হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতারণা ইত্যাদি তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। ফলে সমাজে ফিরে আসে শন্তির পরিবেশ।

চার. মানুষ সমাজিক জীব। তাই সে একাকী বসবাস করতে পারেনা। সমাজে চলতে গেলে প্রয়োজন হয় বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ভালবাসা ইত্যাদি। সমাজে মানুষ একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করলে তারা এগিয়ে যেতে পারে অনেক দূরে। যদি না তাদের সে প্রীতির অভ্যন্তরে জাগতিক উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকে। কারণ, যেখানে কৃত্রিমতা থাকে, সেখানে চূড়ান্ত সফলতা আসতে পারেনা। ইসলাম অকৃত্রিম ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছেন। একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই একে অপরকে ভালবাসলে তাদের জন্য রয়েছে পরকালের ওই পুরস্কার।

পাঁচ. আমাদের সবার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। তিনি আমাদের সুখ-দু:খ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদির ব্যাপারে ভাল জানেন। কোথায় আমাদের জন্য সুখ-শান্তি রয়েছে কোন পথে চললে শান্তি পাওয়া যাবে সেটা তিনি একমাত্র ভাল জানেন। আজকের বিশ্বে প্রতিটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হলে জানা যাবে, সবাই কম বেশী অশান্তির আগুনে পুড়ছে। সেই অশান্তির লেলিহান শিখা হতে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা সবারই। আর সেটা পূরণের জন্য একটি মূল উপায় স্বয়ং রাব্বুল আলামিন শিখিয়ে দিয়েছেন। আর তা হল আল্লাহ্‌র যিকির। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

أَلا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ-"শোন আল্লাহ্‌র যিকির'র মাধ্যমেই অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত হয়।"

ছয়. পবিত্র ইসলাম ধর্মে ব্যভিচারকে হারাম ঘোষনা করা হয়েছে কঠোরভাবে। আর ঐ ধরনের নিশ্চিত মহাপাপ থেকে ফিরে আসা সত্যিকারের ঈমানদারের পরিচায়ক। একমাত্র খোদাভীতির কারণেই বান্দা ব্যভিচার হতে দূরে সরে আসতে পারে। তাই তার পুরস্কার হিসেবে ওই বান্দাকে হাশরের ময়দানে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করা হবে।

সাত. দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা। তবে ঐ দান হতে হবে নিরেট তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে। লোক দেখানো কিংবা লোকে দানশীল বলুক সে উদ্দেশ্যে যদি দান করা হয় তাহলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবেনা। ইরশাদ হচ্ছে –

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

অর্থাৎ- "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আকৃতি ও ধন সম্পত্তির দিকে দেখেন না বরং তোমাদের অন্তর ও উদ্দেশ্যের দিকেই দেখেন।" তাই দান খয়রাত করতে হবে যতটুকু সম্ভব গোপনে গোপনে। আর এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে হাশরের ময়দানে আল্লাহ্‌র আরশের নিচে আশ্রয় দান করা হবে।

পরিশেষে বলতে হয়, হাদীস শরীফে বর্ণিত সাত প্রকারের মানুষ নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান। যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী করার ক্ষেত্রে মহান ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন আর পরকালেও তাঁরা সফল।

আওলাদে রসূল ﷺ রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত, মুর্শিদে বরহক, গাউছে জামান, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মাঃ জিঃ আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত
কাদেরিয়া তাহেরিয়া আলিম মাদ্রাসা
(হেফ্জ বিভাগ, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং)

রইসুল মুদাররিসীন, ইমামে আহলে সুন্নাত
অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল জলীল (র.)
এর আমিয়াপুর হযরত বিবি ফাতেমা (রা:) হাফেজিয়া মাদ্রাসায়
(এতিমখানা ও লিল্লাহ বোডিং)

যোগাযোগ-ঃ
০১৭১৪-৪৫৪০৭৩, ০১৯১৬-৬৪৭২৬১

আপনাদের সদ্কা, যাকাত, ফিতরা, ও কুরবানীর
পশুর চামড়া বা উহার মূল্যার সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com

মাহে যিলহজ্ব : ফাযায়েল ও মাসায়েল

আরবী চান্দ্র মাসের সর্বশেষ মাস হচ্ছে যিলহজ্ব। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে এ মাসের গুরুত্ব তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক সামর্থ্যবান লোকদের উপর হজ্ব ফরয করেছেন। এই ফরয হজ্ব সম্পন্ন করতে হয় এ মাসের নির্দিষ্ট তারিখে। হজ্বের অন্যান্য বিধানাবলীও পালিত হয় এ মাসেই। এ মাসের কতগুলো দিন বেশী ফযিলতমন্ডিত। এ মাসে লক্ষ-লক্ষ হাজী আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হারামাঈন শরীফাঈনের পাক ভূমিতে বরকতমন্ডিত বান্দা ও স্থানের যিয়ারত দ্বারা ধন্য হন। এ মাসের রোযায় অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি-

যিলহজ্ব মাসের দশদিন

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাাদ করেছে, বছরের দিনগুলোর মধ্যে কোন সময় যাতে প্রচুর নেক কাজ করা হয়, যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর প্রিয় নয়। সাহাবা কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাও এর সমতুল্য নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করাও আল্লাহ্র নিকট এদিনগুলো অপেক্ষা বেশী প্রিয় নয়। বর্ণনাকারী বলেন, তিন তিন বার লোকেরা এই প্রশ্ন করেছেন, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনবারে এই জবাবে ধন্য করেছেন। অতঃপর ইরশাদ করেছেন, "অবশ্য যে ব্যক্তি আপন জান ও মাল সহকারে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করার জন্য গিয়েছে এবং সেখানে জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে আল্লাহ্র প্রিয় হয়েছে (তার বিষয়টি স্বতন্ত্র) [বুখারী শরীফ] ইবন আওয়ানাহ্ ও ইবন হাব্বান আপন আপন সহীহ গ্রন্থে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনার সুত্রে লিখেছেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যিলহজ্ব মাসের দশদিন অপেক্ষা কোন ফযিলতপূর্ণ দিবস নেই।

এতদ ভিত্তিতে বিজ্ঞ আলিমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি বছরের উত্তম দিনগুলোতে রোযা রাখার মান্নত করে, তার উচিত যিলহজ্বের দশদিন রোযা পালন করে মান্নত করে তা পূরণ করা। আর যে ব্যক্তি বছরের কোন একটি উত্তম দিনের রোযা রাখার মান্নত করে, সে যেন আরাফাহ দিবসের (৯ যিলহজ্ব) রোযা রেখে আপন মান্নাত পূরণ করে। যে ব্যক্তি সপ্তাহে কোন দিনে রোযা রাখার মান্নত করে সে যেন জুম'আর দিনে রোযা রাখে।

যিলহজ্ব মাসের দশদিনের ফযিলতের কারণ

এ দিন গুলোর ফযিলতের কারণ হচ্ছে এ দিন গুলোর মধ্যে একদিন হচ্ছে 'আরাফাহ্ দিবস' যেমনি ভাবে রমযানের শেষ দশ রাতের ফযিলতের কারন হচ্ছে ওই রাতগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে 'শবে ক্বদর'। যেহেতু যিলহজ্ব মাসের মধ্যে আরাফাহ দিন আসে সেহেতু এ মাসের এত ফযিলত।

যিলহজ্বের প্রথম দশদিনের রোযা

নিম্নলিখিত হাদীস শরীফগুলো থেকে এ দিনগুলোর রোযার ফযিলত প্রতীয়মান হয়-

এক. আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর কোন পবিত্র বিবি (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোরবাণী ঈদের প্রথম ৯দিন, ১০ মুহাররম, প্রত্যেক চান্দ্র মাসের তিনদিন সর্বাধিক রোযা পালন করতেন। প্রত্যেক মাসের তিন দিনের মধ্যে প্রথম সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।

দুই. অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্বে দশদিন এবং প্রত্যেক মাসের তিনদিন রোযা রাখতেন।

উল্লেখ্য, এ দশদিন সাধারণ অর্থে যে সব নেক কার্যাদি সম্পর্কিত ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, ওইগুলোর মধ্যে রোযাও রয়েছে। রমজানের রোযাগুলো ব্যতিত যিলহজ্বের প্রথম দশদিন রোযার ফযিলত খুব বেশী। আরো লক্ষ্যনীয় যে, যিলহজ্বের প্রথম ৯দিন পূর্ণ দিবস

www.sunnibarta.com

পালন করবে আর দশম তারিখে ওই দিন কুরবাণীর গোশত দিয়ে আহার করা পর্যন্ত রোযা পালন করবে। কারণ, কুরবানীর ঈদের দিন ও এর পরবর্তী তিনদিন (আইয়্যামে তাশরীক) পূর্ণ দিবস রোযা পালন করা হারাম।

কতিপয় সুন্নাত

ক্রমান্বয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কিছু কিছু সুন্নাত লোকেরা সাধারণভাবে ছেড়ে দিতে বসেছে। এ গুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

এক. যে ব্যক্তি কুরবাণী করার ইচ্ছা করেছে- চাই ঐ কুরবাণী ওয়াজিব হোক কিংবা নফল হোক, সে যেন **১**ম যিলহজ্ব থেকে কুরবাণী করা পর্যন্ত আপন চুল, লোম ও নখ কর্তন না করে।

দুই. সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মাহে যিলহজ্বের দশদিনে যদি কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা পোষন করে, তার উচিত হচ্ছে, সে তার শরীর ও চেহারার চুল লোমগুলোতে কর্তনের জন্য হাত না দেয়।

তিন. এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি কুরবাণী ঈদের চাঁদ দেখে কুরবাণী করার ইচ্ছা করে সে যেন (কুরবাণী করা পর্যন্ত) নখ না কাটে, চুল না ছাটবে, না মুন্ডন করবে।

চার. জামেউল উসূলে সহীহ মুসলিমের এ বর্ণনা ওমর ইবনে মুসলিম ইবনে আম্মার লায়সীর সুত্রে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হযরত ওমর ইবনে মুসলিম বলেছেন, কুরবাণী ঈদের পূর্বে একদিন আমি পাবলিক গোসল খানায় গেলাম এবং সেখানে 'নওরাহ' লোমনাশক পাউডার লাগলাম। তখন গোসল খানায় যাওয়া অন্য লোকেরা বললো, "আপনি একী করছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এদিনগুলো লোম উপরাতে কাটতে বা মুন্ডাতে নিষেধ করেছেন।" এরপর ওমর ইবনে মুসলিম এবং হযরত সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যেবের নিকট গেলেন এবং এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, হে আমার ভাতিজা, লোকেরাতো এ হাদীস ভুলে বসেছে। এটা অনুসারে আমল করা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর এ নির্দেশ বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে- যে ব্যক্তি ঈদের চাঁদ দেখেছে তার উচিত হচ্ছে- সে যেন নখ না কাটে, চুল ও লোম না উপড়ায়।

আরাফাহ দিবসের ফযিলত

৯ যিলহজ্বকে আরাফাহ দিবস বলে। আরাফার দিন উত্তম না জুম'আর দিন উত্তম? এ বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমদের মতামত রয়েছে। এর বিশুদ্ধ সমাধান হচ্ছে, গোটা বছরের দিনগুলোর মধ্যে জুম'আর দিন উত্তম। অবশ্যই ওই আরাফাহ দিবস সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে আরাফাহ দিবস জুম'আর দিনে আসে।

আরাফাহ দিবসের রোযা

প্রায় সব ইমামের মতে, আরাফাহ দিবসে রোযা রাখা উত্তম। আর যারা আরাফার ময়দানে থাকেন, তারা যেন এ দিবসের রোযা রাখার ব্যাপারে যত্নবান হন। হযরত উম্মুল ফজল বিন্‌তে হারিসের বর্ণনা- আমি আরাফাহ দিবসে সরওয়ারে কায়েনাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলাম। এ দিনে হুযুরের রোযা পালন নিয়ে লোকেরা বিতর্ক লিপ্ত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখছেন, আর কেউ কেউ বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখেননি। এটা শুনে উম্মুল ফজল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আরাফাতের ময়দানে এক পেয়ালা দুধ পাঠালেন। সেটা তিনি প্রকাশ্যে পান করে নিলেন। তখন হুযুর উটনীর উপর আরোহী ছিলেন। [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত মুআমূনাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম তিরমিযি উদ্ধৃত, হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের সূত্রে বর্ণিত হাদিস শরীফে এমনও বর্ণনা এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ও আরাফাতে রোযা রাখেননি মর্মে বর্ণনা এসেছে। তবে এ হাদীস এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরাফাহ দিবসে রোযা রাখার নির্দেশও দেননি। অবশ্য রোযা রাখতে

www.sunni

নিষেধও করেননি। সুতরাং এতদভিত্তিতে এভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। কিন্তু যে সব হাজী রোযা রাখলে ইবাদত তথা হজ্বের বিধানাবলী পালন করার ক্ষমতা রাখেনা, তাদের জন্য মুস্তাহাবও নয়। অন্যান্য হাজী যারা আরাফাতে থাকে না তারা যদি আরাফার দিনে রোযা পালন করে, তার গত ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহ্‌ও কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। [মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্]

নফল নামাজ

যিলহজ্ব মাসের ১ম রাতে এশার নামাযের পর চার রাক'আত নামাজ দু'সালামে পড়বেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ২৫ বার করে পড়বেন। আল্লাহ্ পাক এ নামায সম্পন্ন কারীকে অগণিত নামাযের সাওয়াব দান করবেন।

প্রথম রাত থেকে দশম রাত পর্যন্ত প্রতিদিন এশার নামাযের পর দুই রাক'আত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাউসার তিনবার করে ও সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়বেন। ইন শা আল্লাহ্ তা'য়ালা, এ নামাযের মহত্বের কারণে আল্লাহ্ পাক তার আমলনামায় অগণিত নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং অগণিত গুনাহ মার্জনা করবেন।

প্রথম রাত থেকে দশম রাত পর্যন্ত এশার এর নামাযের পর আরো দু'রাকাত নামায এভাবে পড়া যায়। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার সূরা ইখলাস ১৫ বার এবং ২য় রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার শেষ রুকু একবার, সূরা ইখলাস পনের বার পড়বে। এ নামাযের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'য়ালা এ নামায সম্পন্নকারীর পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যদিও তার গুনাহ মরূভূমির বালুকণার সমানও হয়।

২য় রাতে এশারের নামাযের পর আরো চার রাক'আত নফল নামাজ দু'সালামে পড়তে পারেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আয়াতুল কুরসী, ৩ বার সূরা ইখলাস, তিনবার সূরা ফালাক্ব, ৩ বার সূরা নাস পড়বেন। সালাম ফিরানোর পর এগার বার দরূদ শরীফ পড়ে দু'আর জন্য হাত উঠিয়ে নিম্নলিখিত দু'আ পড়বেন-সুবহা-না যিল 'ইযযাতি ওয়াল জাবরূতি সুবহা-না যিল কুদরাতি ওয়াল মালাকূ-তি, সুবহা-নাল হায়্যিল লাযী লা-ইয়ামু-তু, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ামূতু, ওয়াহুয়া হাইয়্যুন লা ইয়ামূ-তু, সুবহা-নাল্লা-হি রাব্বিল ইবা-দি ওয়াল বিলা-দি, ওয়াল হামদু লিল্লাহি কাসী-রান, তাইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান্ আলা কুল্লি হা-লিন। আল্লাহু আকবার কাবী-রান, রাব্বানা ওয়া জালা-লুহ্ ওয়া কুদরাতুহ বিকুল্লি মাকান।

দু'আর পর পুণরায় ১১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যে দু'আ করবেন, ইনশা আল্লাহ্ তা কবূল হবে।

যিলহজ্বের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতে এশার নামাযের পর দু'রাকাত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাউসার একবার পড়বেন, সূরা ইখলাস একবার পড়বেন। নিষ্ঠার সাথে নামায সম্পন্নকারী আপন জীবদ্দশায় বেহেশতে আপন স্থান দেখে নেবে।

যিলহজ্ব মাসের প্রথম জুম'আর নামাযের পর ৬ রাক'আত নামায তিন সালামে পড়বে। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পনেরো বার করে পড়বেন। সালাম ফিরানোর পর দশবার নিম্ন লিখিত দু'আ পড়বেন- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল মালিকুল হাক্কুল মুবীন।

এর পূর্বাপর এগারবার করে দরূদ শরীফ পড়ে এ নামায কবুল হবার জন্য এবং গুনাহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দু'আ করবেন। ইন শা আল্লাহ্ তিনি আপন পূর্ণ কুদরত দ্বারা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

যিলহজ্বের দশম তারিখ এশার নামাযের পর চার রাক'আত নফল নামায এক সালামে পড়বেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস একবার, সূরা ফালাক একবার, সূরা নাস একবার পড়বেন। সালাম ফিরানোর পর সত্তরবার 'সুবহানাল্লাহ্' ও সত্তরবার 'দরূদ শরীফ' পাঠ করে আল্লাহ্‌র দরবারে গুনাহ মাগফিরাতের জন্য দু'আ করবেন। এ নামাযের বরকতে তিনি এ নামায সম্পন্ন কারীর পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।

যিলহজ্ব চান্দ্র মাসের শেষ মাস। সেহেতু বছর সমাপ্তি নফল নামায পড়াও বিশেষ উপকারী। যিলহজ্ব মাসের ২৯ কিংবা ৩০ তারিখে অর্থাৎ বছরের শেষ দিনে দু'রাকাত নফল নামায জোহর কিংবা মাগরিবের নামাযের পরে পড়বেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়বেন। সালাম ফিরানোর পর নিম্নলিখিত কালেমাগুলো সাতবার পড়া চাই। এটা জান ও মালের হিফাযতের জন্য অতি উত্তম।

তাকবীরে তাশরীক

এ মাসের ৯ তারিখ ফযরের নামায হতে ১৩ তারিখ আসরের ওয়াক্তের ফরয নামায পর্যন্ত প্রতি নামাযের পর নিম্নের তাকবীর পাঠ করতে হবে এবং ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পাঠ করে নিবে।

তাকবীর : আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।

ঈদুল আযহার রজনীতে আল্লাহ্‌র নিশ্চিত করুণা লাভের পঞ্চরাত্রির অন্যতম। এ রাতে বিনিদ্র থেকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত করার মধ্যে অশেষ কল্যাণ ও সাওয়াব রয়েছে।

এ মাসে ওফাত প্রাপ্ত বুযুর্গানে দীন

১ যিলহজ্ব	:	খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
১যিলহজ্ব	:	হযরত শাহসূফী আমানত খান রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৭ যিলহজ্ব	:	হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৮ যিলহজ্ব	:	ইমাম মুসলিম ইবনে আকিল রহমাতুল্লাহি আলায়হি
৮ যিলহজ্ব	:	ইমাম আবু যর গিফার রহমাতুল্লাহি আলায়হি
১৫ যিলহজ্ব	:	হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি
১৭ যিলহজ্ব	:	হযরত ইমাম আবু বকর শিবলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
১৮ যিলহজ্ব	:	হযরত না'ঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি
১৯ যিলহজ্ব	:	মাহবুবে ইলাহি হযরত নিযামুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলায়হি
২৬ যিলহজ্ব	:	হযরত খান জাহান আলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ, রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪

ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

www.sunnibarta.com

হজ্ব ও যিয়ারত : মক্কা ও মদিনা

অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল (র.)

পবিত্র মক্কা মদিনা মুসলমানদের নিকট অতি প্রিয়। মক্কা মদিনাকে কেন্দ্র করেই বিশ্ব মুসলিম জীবিত ও পরিচালিত। প্রতি বৎসর বিশ্ব মুসলিম মিলন কেন্দ্র বসে পবিত্র মক্কা ও মদিনাতে। লাখো মুমিনের প্রাণস্পন্দনে মুখরিত হয়ে উঠে পবিত্র নগরীদ্বয়। এর মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ়তর হয়। হাজীগণ নতুন প্রেরণা নিয়ে ফিরেন দেশে এবং পরবর্তী পবিত্র জীবন যাপনে সচেষ্ট হন। সুতরাং মক্কা মদিনার প্রভাব সুদূর প্রসারী।

এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হজ্ব ও যিয়ারতের একটি শক্তিশালী প্রভাব কাজ করছে। দুনিয়ার অন্য জাতিরা ঈমানী মুসলমানদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব দেখে ইসলামী সংহতির মূল সূত্র অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছে। মূলত: এই দুই ঈমানী কেন্দ্রই আজো মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করে রেখেছে- ঈমানী ও রূহানী শক্তিতে। তাই হজ্ব মৌসুম তথা শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্ব মাসে সারা মুসলিম বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি হয়। কেউ হজ্বের প্রস্তুতি নিচ্ছে, আত্মীয় স্বজনরা যোগান দিচ্ছে, বিদায় জানাচ্ছে। এ যেন ঈমানী চেতনার এক জাগরণ। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল এর মাধ্যেমে এই হজ্বের ব্যবস্থা করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে নিজ পুত্র ইসমাঈল (আঃ)কে নিয়ে তৈরী করেন পবিত্র খানায়ে কা'বা বা বায়তুল্লাহ শরীফ।

তাফসীরে না'ঈমীর সুত্রে জানা যায়- এই পবিত্র ঘর তৈরী হয় শাওয়ালের ২৫ তারিখ থেকে ২৫ যিলক্বদের মধ্যে। এতে স্থাপিত হয় পবিত্র হাজরে আসওয়াদ। এরপরই খোদার নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হজ্বের ঘোষনা দেন। কিয়ামত পর্যন্ত যারা হজ্জ করবেন- তাদের প্রত্যেকের কানে হযরতের ইব্রাহীম (আঃ) এর সেই দিনের আওয়ায পৌছে ছিল বলে পবিত্র হাদিসে প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ইরাকের বাবেলে। পিতৃভূমি ছেড়ে তিনি হিজরত করেছিলেন ফিলিস্তিনে হিবরুন শহরে এবং ইন্তিকাল করেছেন সেখানে। তাঁর পবিত্র মাযার ঘিরে গড়ে উঠেছে বর্তমানে খলিলুর রহমান শহরটি। প্রিয়পুত্র হযরত ইসহাক (আঃ) নাতী হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং প্রপৌত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) এর বংশে ৭ হাজার মতান্তরে সত্তর হাজার পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে তাঁর মাতা বিবি হাজেরা (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও শিশু পুত্রকে একাকী জনমানবহীন মক্কা প্রান্তরে রেখে যান। আল্লাহ্র ইচ্ছায় নবী ইসমাঈল (আঃ) এর পদাঘাতে সৃষ্ট হয় যমযমের কুপের পানি। আস্তে আস্তে শুরু হয় জনমানবের বসবাস। ইয়েমেনের বাণিজ্য কাফেলা বণী যুরহম প্রথমে এখানে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ বংশে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর বিবাহ হয় এবং বংশ বিস্তার ঘটে।

পিপাসার্ত পুত্রের জন্য পানির তালাশে মা হাজেরা সাতবার সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। তাই তার স্মরণে হাজীগণ কিয়ামত পর্যন্ত সাফা-মারওয়া সায়ী করতে থাকবেন। এটি হজ্বের ওয়াজিব অংশ। আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই আপন প্রিয়জনকে স্মরণীয় ও সম্মানিত করে রাখেন। তাদের দ্বারা সংঘঠিত কার্যকলাপকে ইবাদতরূপে পরিণত করে থাকেন। প্রতিটি ইবাদতই মূলত: কোন নবী রাসূল ও ওলীদের কার্যকালাপ ছাড়া কিছুই নয়।

কুরবাণী ঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ) যখন ১২/১৩ বৎসরে উপনিত হন, তখনই হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর উপর নেমে আসে এক মহা পরীক্ষা। তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হন প্রিয় পুত্রকে কুরবাণী করার জন্য। পুত্রের মতামত জানতে চাইলে পুত্র জবাব দেন "হে পিতা! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, তা বাস্তবায়িত করুন। আমাকে ইন শা আল্লাহ্ ধৈর্যশীল পাবেন।" এই মহান কুরবাণীর ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমান মিনায়। সেখান থেকে

www.sunnibarta.com

সুত্রপাত হয় কুরবাণী প্রথার। সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কুরবাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটি তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রথা। এটা ধনীদের জন্য ওয়াজিব। কুরবাণীর লক্ষ-কোটি পশু কুরবাণীর পবিত্র অনুষ্ঠানটি একদিকে ইবাদত, অন্যদিকে হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ঘটনা স্মারকও বটে।

হজ্বঃ পুত্রের ঘটনার ৬/৭ বৎসর পর যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বয়স ১৯/২০ বছর হয়, তখন নির্দেশ হয় খানায়ে কা'বা তৈরীর। যা বর্তমান বিশ্বে একমাত্র বৈধ কিবলা। আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন পিতা পুত্র খানায়ে কিবলা নির্মাণ করেছিলেন- তখন একখানা পাথর এর উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) খানায়ে কাবার পাথর গেঁথেছিলেন। পাথরটি তার পায়ের নিকট নরম হয়ে যায়। এতে হযরতের কদম মোবারকদ্বয়ের ছাঁপ পড়ে যায়। এ পাথরকে বলা হয় মাকামে ইব্রাহিম। খোদার ঘর সাত চক্কর দিয়ে এক তাওয়াফ সমাপ্ত করে হাজীগণ কর্তৃক উক্ত মকামে ইব্রাহিমকে সামনে রেখে দু'রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামায আদার করার জন্য খোদা তা'আলার নির্দেশ। এটা করা ওয়াজিব। এতেও একজন নবীর কদমের বরকতের সম্মান করা হয়। কোন হাজী যদি এটাকে অবজ্ঞা করে, তাহলে তাঁর হজ্ব পূর্ণ হবেনা।

খানায়ে কা'বার উদ্বোধন : জিলহজ্ব মাসের ২৫ তারিখ খানায়ে কা'বা তৈরী সম্পন্ন করে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে নিয়ে এর উদ্বোধন উপলক্ষে দাঁড়ানো কিয়াম অবস্থায় তিনটি দু'আ করেছিলেন বলে আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ডে ২৬১ পৃষ্ঠায় আল্লামা ইবনে কাছির উল্লেখ করেছেন। দু'আ তিনটি কুরআন মজিদের সূরা বাকারার ১২৭, ১২৮, ১২৯ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত দোয়া গুলো ছিল, ১. খানায়ে কা'বা কবুল করার জন্য প্রার্থনা। ২. পিতা পুত্র উভয়কে আজীবন আল্লাহ্‌র অনুগত রাখা এবং ইসমাঈল (আঃ) এর বংশে কিছু লোককে ঈমানের উপর সর্বদা কায়েম রাখা। ৩. রোজে আযলের দিনে প্রতিশ্রুত সেই মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আরব দেশে ইসমাঈল (আঃ) এর বংশে প্রেরণ করা। পিতা পুত্র সে সময় কিয়াম অবস্থায় ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্ম বৃত্তান্ত শুনে বা বর্ণনা করে সেই মহান নামের সম্মানে কিয়াম করা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এর সুন্নাত। মুফাস্‌সিরগন এ কথা উল্লেখ করেছেন এবং মিলাদ কিয়ামকে মুস্তাহাব বা উত্তম বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন।

এতে একটি বিষয় প্রমাণিত হলো যে, নবীদের জন্মের পূর্বেই এই মিলাদ ও কিয়ামের ভিত্তি রচিত হয়েছে। এটাকে বিদ'আত বা মন্দ অর্থে ব্যবহার করা বেয়াদবী এবং নবীজির অবমাননা ছাড়া কিছু নয়। এতে আরো প্রমাণিত হলো যে, যে কোন ভাল কাজ উদ্বোধনের সময় মিলাদ ও কিয়াম করা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর ৪ হাজার বৎসরের পুরাতন সুন্নাত বা প্রথা। এ প্রসঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর উম্মতদেরকে নিয়ে দাঁড়িয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বিলাদত বা আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন বলে ইবনে কাছির তাঁর আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।

এভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের ৫৭০ বৎসর পূর্বেই হযরত ঈসা (আঃ) মিলাদ কিয়ামের প্রথা চালু করে গেছেন। মিলাদ-কিয়াম বিরোধী ওলামাগণ উক্ত কিতাবখানা দেখে নিবেন এবং ঈমানের নজরে দৃষ্টিদান করলে আশা করি হেদায়ত পেয়ে যেতে পারেন। সেখানে পরিস্কার কিয়ামের উল্লেখ আছে।

মক্কও মদিনা : যাক প্রসঙ্গ ছিল হজ্ব ও যিয়ারত এবং মক্কা ও মদিনা। উভয়টি আমাদের প্রাণপ্রিয় কেন্দ্র। উভয়টির গুরুত্ব অতি ব্যাপক। মক্কা শরীফ হলো কপাল ও নামাযের কেবলা। কিন্তু মদিনা হলো দিলের কেবলা। মক্কা হলো আমাদের কিবলা। কিন্তু মদিনা হলো কা'বার ও কা'বা। হযরত খাজা গরীবে নাওয়াজ (র.) বলেছেন, "হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনি

হচ্ছেন দিলের কা'বা এবং জীবনের কেবলা। তাই নামাজান্তে আমি মিসকিন হাসান সাঞ্জারী সর্বদা আপনার দিকে দিল ও মনকে ঝুকিয়ে রাখি" (আল বাছায়ের)। মক্কা শরীফ হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ৫৩ বৎসর জিন্দেগীর চরণভূমি। এ কারণে সূরা বালাদে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা নগরীর কসম করেছেন (এক তফসীর অনুযায়ী)। আল্লাহ্ বলেন, "ওয়া আন্তা হিল্লুন বিহাজাল বালাদ" আপনার জন্য মক্কার পবিত্র জমিন হালাল করা হলো সাময়িক যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য এবং আপনি এই মক্কার জমীনে বসবাসকারীও বটে।

তাফসীরে না'ঈমীতে উল্লেখ করা হয়েছে, মক্কা নগরিতে বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক নিদর্শন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা ঐগুলো উল্লেখ না করে শুধু নবীজির পদচারনার কারণেই উক্ত শহরের শপথ করেছেন। যেমন চারটি শহরের শপথ করা হয়েছে চারজন নবীর সম্মানে। ডুমুর ফলের কসম করা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বাসস্থানে সম্মানে। যয়তুন ফলের কসম করা হয়েছে হযরত ঈসা (আঃ) এর সম্মানে এবং মক্কা নগরীর কসম করা হয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানে (দেখুন তফসীরে না'ঈমী)।

মক্কায় রয়েছে হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইব্রাহীম, যমযম, সাফা-মারওয়া, মীনা মুযদালিফা, আরাফাত। কিন্তু মদিনায় রয়েছে সমগ্র নিদর্শনের বড় নিদর্শন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। মক্কায় খানায়ে কাবায় রোকনে ইয়ামেনীতে ৭০ জন ফেরেস্তা সব সময় মোতায়েন থাকেন বলে হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মদিনা মুনাওয়ারায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর রওজা মোবারক যিয়ারত করতে প্রতিদিন এক লক্ষ ফেরেশতা অবতীর্ণ হন বলে মেশকাত শরীফে কারামত অধ্যায়ে হাদিস বর্ণিত রয়েছে এবং মা আয়েশা সিদ্দিকা (র:)'র এতে সমর্থন রয়েছে।

মক্কা মোয়াজ্জামায় পবিত্র কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছিল ১৩ বৎসর। ঐ সময় অবতীর্ণ সূরা গুলোর নাম মক্কী। কিন্তু মদিনা শরীফ হিযরত করার পরে ১০ বৎসর যে সূরা গুলো নাযিল হয় সেগুলোর নাম মাদানী। কুরআন শরীফের সুরার এরূপ নাম হওয়ার কারণ কি? যেহেতু যার উপর নাযিল হয়েছে- তিনি হচ্ছে মক্কী ও মাদানী। পূর্বে কুরআনের এরূপ নাম ছিল না। হযরত মূসা (আঃ) তাওরাত কিতাব গ্রহণ করার জন্য তূর পর্বতে চল্লিশ দিন চিল্লা করেছিলেন। কিন্তু কুরআন মজীদকে গিয়ে আনতে হয়নি বরং জিবরাঈল (আঃ) নিজে বহন করে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র খেদমতে। কুরআন ও জিবরাঈল সব সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অনুস্মরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলের অনুসন্ধানে কোন দিন বের হননি।

মক্কা মুয়াজ্জামা হচ্ছে জমীনের মধ্যে পবিত্রতম স্থান। কিন্তু মদিনার রওযা মোবারকের মাটি হচ্ছে আরশে মোয়াল্লার চেয়েও পবিত্রতম স্থান। (দেখুন ফতোয়ায়ে শামী যিয়ারত অধ্যায়) এর কারণ বর্ণনা করেছেন শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) তাঁর জযবুল কুলুব গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, যতদিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে ছিলেন ততদিন মক্কা ছিল উত্তম। কিন্তু হিযরতের পর মদীনা শরীফ উত্তম হয়ে যায় রাসূলে পাকের অবস্থানের কারণে। এটাকে আরবীতে বলা হয় "শরফুল মকানে বিল মাকীন" অর্থাৎ অবস্থানকারীর সম্মানে ঐ স্থানের সম্মান বেড়ে যায়। সুতরাং সৃষ্টির সেরা নবীর অবস্থানের কারণে মদিনা মুনাওয়ারা রওযা মোবারকের মর্যাদাও সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে। এটা চার মাযহাবের চার ইমামের সর্বসম্মত রায়। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন "মক্কার চেয়ে মদিনা উত্তম"। (তাবরানী শরীফ)

হজ্ব ও যিয়ারত : হজ্বের মর্যদা যেমন স্বীকৃত, তেমনিভাবে নবীজির যিয়ারতের মর্যদা ও সর্বজন স্বীকৃত। মক্কায় হজ্ব করলে জীবনের গুনাহ ধুয়ে মুছে যায়। কিন্তু রওযা মোবারক যিয়ারতে নবীজি স্বয়ং

www.sunnibarta.com

উম্মতের জামিনদার হয়ে যান। সকলেই স্বীকার করবেন গুনাহ মাপ হওয়ার চাইতে নবীজির শাফায়াত ও যিম্মাদারী অনেক উত্তম। নবীজির যিয়ারত ও রওযা মোবারকের যিয়ারত এই দুই রকমের যিয়ারতের ফযিলত হাদীস শরীফে উল্লেখ হয়েছে। রওযা মোবারক যিয়ারত সম্পর্কে নবীজি ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার মাযার যিয়ারত করবে, তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।"

অপর হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করবে, সে যেন জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করলো। অন্য হাদীসে সরাসরি যিয়ারতের ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই সরাসরি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে, কাল কিয়ামতের ময়দানে তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে"। এই হাদীস গুলোর মর্মার্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হুজুরের সরাসরি যিয়ারত করার মত মানুষ এখনো দুনিয়াতে আছে। উভয়টির মধ্যে পার্থক্য আছে।

মক্কা শরীফের মসজিদে হারামের নামাযের ফযিলত সংখ্যার দিক দিয়ে পঞ্চাশ হাজার হলেও গুণের দিক থেকে মদিনার মসজিদের নববীতে মূল্য অনেক বেশী। শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহ:) তার জযবুল কুলুব গ্রন্থে এভাবে দুই মসজিদের নামাযের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর অবস্থানের কারণেই গুণগত এই তারতম্য হয়েছে। এখানে অন্য কোন কারণ নেই। নবীজির চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারেনা। আমাদের নবীজির সংস্পর্শের মর্যদাই আলাদা। এর সাথে অন্য কিছু তুলনা হয়না। এটাই শেষ কথা।

মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাযের ফযিলত হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করবে আল্লাহ্ পাক তাকে দুটি শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন- একটি মুনাফিকের শাস্তি, অন্যটি হলো জাহান্নামের শাস্তি। (জযবুল কুলুব)।

হাজী ভাইদের খেদমতে আরয, যাঁর উছিলায় হজ্ব নসীব হয়েছে এবং জীবনের গুনাহ মাফ হয়েছে তার পবিত্র রওযা মুবারকের সবচেয়ে বেশী কুরবত ও সান্নিধ্যের মাধ্যমে একিন করে মদীনা শরীফ যাবেন এবং আদব ও মহব্বত বজায় রাখবেন। এতেই সাফল্য আসবে এবং হজ্ব ও কবুল হবে। আমিন।

www.sunnibarta.com

সফরের জন্য সর্বনিম্ন ৪৮, না ৫৭ মাইল?

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

হযরত মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা ততটুকু দূরত্বে সফর করে গেলে নামাযে ক্বসর করতেন, যতটুকু মক্কা ও তায়েফের মধ্যে, মক্কা আসফানের মধ্যে এবং মক্কা জিদ্দার মধ্যে দূরত্ব রয়েছে। ইমাম মালিক বলেন, এ দূরত্ব হচ্ছে চার 'বারীদ'। (মুআত্তা'র বরাতে মিশকাত শরীফ সফরের নামায অধ্যায়)

উপরোক্ত 'বারীদ' শব্দটির পরিমাণ থেকেই ইমামগণ সফরের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। 'বারীদ' আরবী শব্দ, চার 'ক্রোশ'-এ এক 'বরীদ'। সুতরাং চার 'বরীদ'-এ ষোল ক্রোশ হল। আরবের এক ক্রোশে আরবী তিন মাইল হয়। সুতরাং ষোল ক্রোশে ৪৮ মাইল হল। (লুম'আতের বরাতে 'মিরআত' : ২য় খন্ড : পৃ. ৩১৬)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র গবেষণা মতে, ইংরেজী মাইল ১৭৬০ গজ হিসেবে এ দূরত্ব দাঁড়ায় ৫৬ মাইল।

অর্থাৎ কেউ কমপক্ষে আরবী ৪৮ মাইল অথবা ইংরেজী ৫৭ মাইল দূরত্বে সফর করে ওখানে কোন এক জায়গায় ইক্বামতের নিয়্যতে কমপক্ষে ১৫ দিনের জন্য অবস্থান আরম্ভ না করা পর্যন্ত সে ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ফরয নামায ক্বসর তথা (২ রাক'আত) পড়বে এমনটি এ দূরত্ব অতিক্রম করার সময় পথেও ক্বসর করবে।

সফরে 'ক্বসর' করা ওয়াজিব

আমাদের হানাফী মাযহাব অনুসারে সফরে ক্বসর করা ওয়াজিব। সফর অবস্থায় পূর্ণ নামাজ পড়ার কোন ইখতিয়ার নেই। কারণ, হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন 'ক্বসর' হচ্ছে মুসলমানদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাদক্বাহ। অতঃপর হুযূর নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন, "ফাক্ববালূ সাদাক্বাতাহু সুতরাং তোমরা তাঁর সাদক্বাহ বা দান গ্রহণ কর।" এখানে 'ফাক্ববালূ' (গ্রহণ কর) 'আমর' (নির্দেশ) আর 'আমর' হচ্ছে ওয়াজিব নির্দেশক। (হাদীস-ই-ইয়ালা:মিরআত, ২য় খন্ড, অধ্যায়, সফরের নামায)

তাছাড়া, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিনায় দুই রাক'আত ক্বসর পড়েছেন। তাঁর পরে হযরত আবু বকর'র পর হযরত ওমর, তারপর হযরত ওসমান আপন খিলাফতের শেষভাগে মক্কা মু'আয্যমায় এসে বিশেষ কারণে (নও মুসলিমদের এক সংশয় অপনোদন) তিনি মুক্বীম হয়ে যেতেন বিধায়, মিনার পূর্ণ নামায পড়তেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসাফিরের জন্য এ ইখতিয়ার নেই যে, ক্বসর কিংবা পূর্ণ নামাজ পড়বে বরং তাঁর উপর ক্বসর পড়াই ওয়াজিব, তথা ফরয। তাঁরা কখনো কোন সফরে মুসাফির অবস্থায় পূর্ণ নামায পড়েননি এবং মুক্বীম অবস্থায় কখনো ক্বসর পড়েননি। এটা আমাদের হানাফী মাযহাবের সর্বসম্মত অভিমত।

ইমাম শাফেঈর মতে সফরে ক্বসর কিংবা পূর্ণ নামায উভয়ই পড়া যায়। তিনি মনে করেন যে, হযরত ওসমান ও হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সফরে এমনটি করা বৈধ মনে করতেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা ছিল অবাস্তব ধারণা। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ত'আলা আনহা নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, সফরের নামাযকে নামায ফরয হবার প্রথমে বিধানের উপর রাখা হয়েছে। অর্থাৎ দু'দু' রাক'আত ছিল। ফজরকে দুই রাক'আত রাখা হল, মাগরিবকে তিন করে দেয়া হল। আরো উল্লেখ্য যে, এখন সফরে ক্বসর করা তেমনি ফরয, যেমনটি মুক্বীম থাকাবস্থায় পূর্ণ নামায পড়া ফরয। সুতরাং হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কখনো নিজের বর্ণনার পরিপন্থী কাজ করতে পারেন না। আর হযরত ওসমান তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাগে মিনায় ক্বসর পড়তেন, শেষভাগে তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্বীম হয়ে যেতেন বিধায় পূর্ণ নামায পড়তেন এতদ্ব্যতীত তিনি

কখনো সফরে পূর্ণ নামায পড়েননি। (মিরআত : ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৫)

তদুপরি, সফরে মুসাফিরের উপর শরীয়ত ২ রাক'আত ফরয করেছে, ৪ রাক'আত নয়। তাই, সফরে ফরয নামায ৪ রাক'আত পড়া শরীয়ত বিরোধী। সুতরাং সফরে দুই রাক'আত তেমনি পূর্ণাঙ্গ নামায যেমনটি মুক্বীম থাকা অবস্থায় চার রাক'আত। সফরে পূর্ণ চার রাক'আত পড়া তেমনি মন্দ, যেমন ফজরের ফরয চার রাক'আত মন্দ। কিংবা ঘরে যোহরের ফরয নামায ছয় রাক'আত পড়ার মত শরীয়ত বিরোধী। এখানে আরো স্মর্তব্য যে, সফরের নামায দুই রাক'আত কম পড়া হলেও সওয়াব পূর্ণ চার রাক'আতেরই পাওয়া যাবে। (লুম'আতের বরাতে মিরআত ২য় খন্ড : পৃ.৩১৬)

দু'ওয়াক্বতের নামায এক সাথে পড়া

এখানে প্রথমে এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, যোহরের ওয়াক্বতে যোহরের সাথে আসরের নামায পড়ে নেয়া এটা হচ্ছে 'জাম'ই তাক্বদীম' (অগ্রিম একত্রিত করা)। পক্ষান্তরে যোহরের নামাযকে বিলম্বিত করে আসরের ওয়াক্বতে যোহরের নামায আসরের সাথে পড়া-এটা হচ্ছে 'জাম'ঈ তা'খীর বিলম্বে একত্রিত করা); অর্থাৎ নামাযকে ওয়াক্বতের পরে পড়া।

এ প্রসঙ্গে আমাদের হানাফী মাযহাব মতে, নামাযকে তার ওয়াক্বত আসার পূর্বে পড়লে তা শুদ্ধই হবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, "আমি কখনো নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালামকে কোন নামাযকে তার ওয়াক্বত ব্যতীত পড়তে দেখিনি।" তিনি তাবুকের যুদ্ধে হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলেন। হুযূর প্রতি ওয়াক্বতের নামায আপন আপন ওয়াক্বতে পড়েছেন। সুতরাং দু'ওয়াক্বতের নামায একত্রে পড়ার অবকাশ নেই। আর কোন নামাযকে তার ওয়াক্বতে না পড়ে পরবর্তী ওযাক্বতে পড়লে তা হবে ক্বাযা নামায। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নামাযকে তার ওয়াক্বতে না পড়ে পরে না পড়লে তা হবে জঘন্য গুনাহ।

ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র মতে সফরে জম'ই তাক্বদীম ও 'জম'ই তাখীর উভয়টি জায়েয। তিনি হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে ছিলেন। তখন সফর আরম্ভ করার পূর্বে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত, তখন হুযূর যোহর ও আসর'র নামায একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে যাত্রা আরম্ভ করতেন তাহলে যোহর বিলম্ব করে পড়তেন। এমনকি আসরের জন্য অবতরণ করতেন। এভাবে মাগরিবের সময় যখন যাত্রার পূর্বে সূর্য ডুবে যেত তবে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে যাত্রা আরম্ভ করতেন, তবে মাগরিব বিলম্বে পড়তেন। এমনকি এশার জন্য অবতরণ (যাত্রা বিরতি) করতেন। অতঃএব উভয় নামায একত্রে পড়তেন।

যেহেতু একই সফরের বিবরণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র বিপরীত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযকে আপন আপন ওয়াক্বতে পড়তে দেখেছি। তিনি আরো বর্ণনা করেন, তাকে কখনো কোন নামায তার ওয়াক্বত ব্যতীত পড়তে দেখিনি। যেহেতু হযরত ইবনে মাস'উদ, হযরত মু'আয ইবনে জবল থেকে অধিকতর বড় ফক্বীহ ছিলেন এবং তাঁর স্মরণ শক্তিও বেশি ছিল সেহেতু তাঁর হাদীসই বেশি গ্রহণযোগ্য। তদুপরি হযরত মু'আয ইবনে জবলের হাদীস কুরআনে করীমের আয়াত (নিশ্চয় মু'মিনদের উপর নামায আপন আপন ওয়াক্বতে ফরয। (৪ : ১০৩) এবং ওই সব মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসগুলোর পরিপন্থি, যেগুলোতে নামাযের নির্ধারিত সময়গুলোর বিবরণ রয়েছে। এ কারণে হযরত মু'আয ইবনে জবলের হাদীসকে, যা ইমাম শাফে'ঈ গ্রহণ করেছেন, আমাদের ইমাম আ'যম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করেননি।

বাকী রইল হজ্বের মৌসুমে আরাফাহ্ ও মুযদালিফায় মসজিদে নামিরায় ইমামের সাথে জামা'আত সহকারে

যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়া (জম'ঈ তাক্বদীম) এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়ার বিষয়। হজ্বের মৌসুমের এ বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এবং বিশেষ দলীলভিত্তিক। এ প্রসঙ্গে মিশকাত শরীফের বাখ্যাগ্রন্থ মিরআতুল মানাজীহ'র ব্যাখ্যাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে- 'স্মর্তব্য যে, আরাফাহ এবং মুযদালিফাহয় ওই নামাযগুলোর সময়সীমা থেকে সরে গেছে। নবী-ই মুখতার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরাফাহ্ ও মুযদালিফায় ও নামাযগুলোর সময়সীমা এভাবে নির্ধারণ করেছেন। আরাফাতে আসরের নামাযের সময় যোহরের সময়সীমার ভিতর এসে গেছে; আসরের নামায ও যোহরের সময়সীমার ভিতর নয়। আর মুযদালিফায় মাগরিবের ওয়াক্বত এশার ওয়াক্বতের মধ্যে পৌছেনি। এ কারণে যদি কোন হাজী ওই দিন মাগরিবের নামায এশার ওয়াক্বত আসার পূর্বে পড়ে নেয়, তাহলে তার নামায হবেই না। তদুপরি, যে সব বর্ণনায় হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্যসব ক্ষেত্রে দু'নামায একত্রে পড়ার বিবরণ এসেছে। এগুলোকে জাম'ই সূরী (বাহ্যিকভাবে একত্রীকরণ) বুঝানোর উদ্দেশ্যে, জাম'ই হাক্বীক্বী (প্রকৃত একত্রীতকরণ)। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়াক্বতের শেষভাগে এবং পরবর্তী নামাযকে তার নির্ধারিত সময়ের প্রথম ভাগে পড়া বুঝানো হয়েছে। অথবা একত্রীকরণে হাদীসগুলো তা'ভীল বা ভিন্ন ব্যাখ্যার উপযোগী। তাই আমাদের হানাফী মাযহাব মতে হজ্বের মৌসুমে উপরোক্ত দু'টি অবস্থা ব্যতীত অন্য যে কোনো অবস্থায় কোন নামাযকে তার নির্ধারিত ওয়ক্বতের পূর্বে (জাম'ই তাক্বদীম) পড়ে কোন মতেই শুদ্ধ হবে না। আর কোন নামাযকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করে পরবর্তী ওয়াক্বতে পড়লে (জাম'ই তাখীর) জঘন্য গুনাহগার হবে।

জুমা'আহ্র দিনের হজ্ব 'হজ্ব-আকবর' কেন?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ঐতিহাসিক বিদায় হজ্ব জুমু'আহ্র দিবসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই হজ্বকে কুরআনে করীমে সূরা তাওবায় তৃতীয় আয়াতে 'হজ্ব-ই আকবর' বলা হয়েছে "ওয়া আযা-নুম মিনাল্লাহি ওয়া রসূলিহি ইলান্না-সি ইয়াওমাল হাজ্জিল আকবারি" (আর আহবানকারী ঘোষণা দিচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত লোকের মধ্যে 'মহান হজ্ব'র দিনে) মুফাসসিরগণের এক অভিমত অনুসারে এই হজ্বকে 'হজ্ব-ই আকবর' এই জন্য বলা হয়েছে যে, এই বছরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজ্ব করেছিলেন। (তাফসীরে খাজাইনুল ইরফান)

তদুপরি, এই হজ্ব জুমু'আহর দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কারণে মুসলমানগণ ঐ হজ্বকে বিদায় হজ্বের স্মৃতিস্মারক হিসেবে 'হজ্ব-ই আকবর' বলে থাকেন। (সূত্র ঃ প্রাগুক্ত)

তাফসিরে নুরুল ইরফানে এ আয়াতের ব্যখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে- এতে বুঝা গেল যে, যদি হজ্ব জুমু'আহর দিন অনুষ্ঠিত হয় তবে তা হবে 'হজ্ব-ই আকবর' (মহান হজ্ব)। কারণ জুমু'আহর দিনে এক হজ্বের সাওয়াব সত্তর হজ্বের সমান। হুযূরের বিদায় হজ্ব জুমু'আহর দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আয়াত "আল-ইয়াওমা আকমাতুল লাকুম দী-নাকুম" (আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। (৫ : ৩) এর ব্যাখ্যায় তাফসীর 'খাযাইনুল ইরফান'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র নিকট এক ইহুদী আসল এবং তাকে বলল, "হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনাদের কিতাবে এমন একটি আয়াত আছে ওই আয়াত যদি আমাদের উপর নাযিল হত তাহলে আমরা ওই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার দিনকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতাম"। তিনি বললেন, "ওই আয়াত কোনটি? ইহুদী এ আয়াত "আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দী-নাকুম........" তিলাওয়াত করল। তিনি বললেন, আমি ওই দিন সম্পর্কে অবগত আছি যাতে সেটা নাযিল হয়েছে ওই স্থান সম্পর্কেও। স্থানটি ছিল আরাফাত আর দিন ছিল জুমু'আহ।

তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তাকেও এক ইহুদী একই কথা বলেছিল। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন- যেদিন

এ আয়াত নাযিল হয়েছিল ওই দিনে দু'টি ঈদ ছিল- জুমু'আহ ও আরফাহ্। (তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান)

তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ আয়াতের তাফসীরে অতি সুন্দর বর্ণনা দেয়া হয়েছে-এ আয়াত শরীফ হুযূরের ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের সময় আরাফাতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। দিনটি ছিল যিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ জুমা'আহ বার, সময় ছিল বাদে আসর। মাহবূবে দু'জাহাঁ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম উষ্ট্রীর উপর আরোহন করে হজ্বের খোতবা প্রদানকালে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। অতি আনন্দের বিষয় যে, ওইদিন মুসলমানদের তিনটি ঈদের সমাবেশ ঘটেছিল। জুমা'আহর ঈদ, হজ্বের এবং মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দীদারের ঈদ। (তাফসীরে রূহুল বয়ানের বরাতে শানে হাবীবুর রহমান মিন আয়াতিল ক্বোরআন : পৃ. ৫১)

হযরত আবূ লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "জুমু'আহর দিন আল্লাহ্‌র নিকট সমস্ত দিনের সরদার এবং সমস্ত দিন অপেক্ষা বড় মর্যাদাবান আর সেটা আল্লাহ্‌র নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর অপেক্ষাও মহান।" (মিশকাত)

মোটকথা, যে হজ্ব জুমা'আহর দিনে অনুষ্ঠিত হয়, ওই হজ্বের সাওয়াব সত্তর হজ্বের সমান। এ হজ্বকে 'হজ্ব-ই আকবর' বলা হয়। (মিরকাত : ২য় খন্ড : পৃষ্ঠা -৩০৬ ও ৩২৫)

প্রশ্ন : কোন কবরে কিংবা কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে সিজদা করা যাবে কি ? কুরআন হাদসির আলোকে জানানোর আবেদন করছি।

মিসবাহুল করিম, পরশুরাম, ফেণী

উত্তর : না, সিজদা করা যাবে না। সিজদা দুই প্রকার।

১. সিজদায়ে তা'আব্বুদী অর্থাৎ ইবাদতের নিয়তে সিজদা করা (২) সিজদায়ে তাজিমী অর্থাৎ সম্মানার্থে সিজদা করা। প্রথম প্রকারের সিজদা করা শির্ক। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য এ ধরনের সিজদা করা কুফুরী। দ্বিতীয় প্রকারের সিজদা হারাম। তথা তাজিমী সিজদাহ করা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুনাহ । এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন-

হাদীস নং ১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

অর্থাৎ-হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "আমি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য"। সূত্র ঃ- তিরমিযী শরীফ, মিশকাত পৃষ্ঠা. ২৮১

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রা.) বলেন- ان السجدة لاتحل لغير الله.

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করা জায়েয নয় বরং হারাম।

www.sunnibarta.com

যিয়ারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম

পীরজাদা মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুর রহিম

সফরের উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ মোতাবেক সফরের হুকুম হয়ে থাকে। অর্থাৎ উপলক্ষ যদি ফরজ হয়, তবে এর জন্য সফর করাও ফরজ। যেমন হজ্জ এর জন্য সফর করাও ফরজ। উপলক্ষ্য যদি হারাম ও নাজায়েয হয়- যেমন-চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, জিনা ব্যভিচার- তাহলে এর জন্য সফর করাও হারাম এবং নাজায়েয। উপলক্ষ যদি সুন্নাত হয়- তাহলে তার জন্য সফর করাও সুন্নাত। যেমন- যিয়ারত। সুতরাং এর জন্য সফর করাও সুন্নাত। (সুবুলুল হুদা)।

কাযী আয়ায (রা.) শেফা শরীফে উল্লেখ করেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য রওজা মোবারক যিয়ারত করা মুসলমানদের সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি উত্তম সুন্নাত- যার উপরে সকলের ঐক্যমত এবং সেখানে ফযীলতের ব্যাপারে উৎসাহ দান করা হয়েছে।

দলিল নং ১

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কেবল আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার রওজা মোবারকে আসবে এবং এই আগমনের মধ্যে কেবল আমার যিয়ারতই তাকে উৎসাহিত করবে- তাহলে পরকালে তাঁর জন্য শাফায়াতকারী হওয়া আমার নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়বে। (তাবরানী মু'জামুল কবীর)।

দলিল নং - ২

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয় বরং একমাত্র আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই সরাসরি আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসবে- তাঁর জন্য সুপারিশ করা আমার নৈতিক দায়িত্ব হয়ে যাবে। (তিবরানী আওসাত এবং দারে কুতনী-এর আমালি গ্রন্থ।)

দলিল নং - ৩

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে- তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে (দারে কুতনী, মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ৪র্থ খন্ড পৃ. ৫৭০)।

দলিল নং - ৪

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি আমার ইন্তিকালের পর আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবিত অবস্থায়ই আমার সাথে সাক্ষাত করল। তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতে খাইরিল ইবাদ ১২ তম খন্ড ৭৫ পৃ.)।

দলিল নং - ৫

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- "যে ব্যক্তি ছাওয়াবের আশায় মদীনাতে আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে- পরকালে তার জন্য আমি শাফায়াত কারী এবং সাক্ষীদাতা হয়ে যাবো।" (ইবনে আবিদ্দুনিয়া, বায়হাকী, সুবুলুল হুদা ১২তম খন্ড ৩৬৭ পৃ.)।

টীকা: কে কোথায় ইন্তিকাল করবে এবং দাফন হবে- আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেনা- কোরআন। কিন্তু হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওসাল্লাম জানেন যে, তিনি মদিনাতেই দাফন হবেন। -এম. এ. জলিল।

দলিল নং -৬

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- "আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি- যে ব্যক্তি আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে-তাঁর জন্য আমি শাফায়াতকারী এবং সাক্ষীদাতা হব।" (আবু দাউদ- সুবুলুল হুদা)।

দলিল নং- ৭

হযরত হাতেব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি আমার বেছালের পর আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে; সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় আমার

www.sunnibarta.com

সাথে সাক্ষাত করল।" (দারেকুতনী, ছুবুলুলহুদা- ১২ তম খন্ড ৩৬৭ পৃ. মাওয়াহিবুল্লাদুনিয়া ৪র্থ খন্ড পৃ. ৫৭১)।

দলিল নং-৮

হযরত ইবনে ওমর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি আমার ইন্তিকালের পর আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় আমার সাথে দেখা করল।"

টীকাঃ হুযূরের হায়াত মউত এক সমান। তিনি সব সময় দেখেন এবং শুনেন- তাই তিনি হায়াতুন্নবী। (তিরবানী, সুবলুল হুদা ১২তম খন্ড পৃ. ৩৭৬)।

দলিল নং-৯

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান "যে ব্যক্তি আমার ইন্তিকালের পর আমার রওজা মেবারক যিয়ারত করবে; সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়- যে আমার জীবিত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাত করার জন্য আমার রওজা মোবারকে এসে পড়লো, তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন আমি সাক্ষীদাতা অথবা শাফায়াতকারী হয়ে যাব। (সুবুলুল হুদা ১২ তম খন্ড ৩৭৬ পৃ.)।

দলিল নং- ১০

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান - যে ব্যক্তি আমার বেছালের পর আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে-সে যে আমার সাথে আমার জিন্দাবস্থায়ই সাক্ষাত করল; আর যে ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাত করল- তার জন্য কিয়ামতের দিন আমি সাক্ষীদাতা অথবা সুপারিশকারী হয়ে যাব। (ছুবুল-১২ তম খন্ড ৩৭৭ পৃ.)

দলিল নং -১১

হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার কবর (রওজা মোবারক) যিয়ারত করবে- সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করল। আর যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতে আসলনা - সে আমার সাথে জুলুম নাফরমানী-গাদ্দারী করল। (ইবনে আসাকির) ছুবুলুল হুদা ১২তম খন্ড ৩৭৭ পৃ.)।

দলিল নং -১২

হযরত বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন নবীজী ইরশাদফরমান- যে ব্যক্তি মদীনাতে আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসবে- তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (ছুবুলুল হুদা ১২ খন্ড পৃ. ৩৭৭)।

বুঝা গেল, হুজুরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নাত। এম.এ. জলিল।

দলিল নং -১৩

হযরত ইবনে ওমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদফরমান- যে ব্যক্তি আমার কবর (রওজা মোবারক) যিয়ারত করবে-তার জন্য আমার শাফায়াত দুরস্ত হয়ে যাবে। (বাযযার-ছুবুলুল হুদা ১২তম খন্ড ৩৭৯ পৃ.)।

দলিল নং- ১৪

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সচ্ছলাবস্থায় আমার কাছে বা আমার রওজা যিয়ারত করতে প্রতিনিধি হয়ে আসল না - সে আমার উপর জুলুম করল। (এহইয়াউল উলূম ১ম খন্ড পৃ. ৩৪৩, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া ৪র্থ খন্ড পৃ. ৫৭১)।

দলিল নং- ১৫

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় মদিনাতে এসে আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে- সে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশী হবে। অর্থাৎ (আমার অতি নিকটে থাকবে) (বায়হাকী, মাওয়াহিব- ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৭২)।

দলিল নং- ১৬

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-"যে ব্যক্তি আমার কবর (রওজা মোবারক) এর নিকট দুরূদ

www.sunnibarta.com

পড়বে; আমি তা শুনে থাকি। (বায়হাকী মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ৪র্থ খন্ড ৫৮৫ পৃ. শিফাউস সিকাম)। তিনি দূরের দরূদও শুনেন, মিশকাত। এম.এ জলিল।

দলিল নং- ১৭

হযরত ইবনে ওমর (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে, সে যেন আমার জীবিত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করল (তিবরানী, দারে কুতনী, এহইয়ায়ে উলুমিদ্দীন ১ম খন্ড ৩৪৩ পৃ.)

দলিল নং- ১৮

হযরত ইবনে ওমর (রা:) হতে বণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- যে ব্যক্তি একমাত্র আমার রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আমার কাছে আসবে- আমার উপর কর্তব্য হয়ে যাবে- যেন আমি তার জন্য শাফায়াত করি। (এহইয়ায়ে উলুমিদ্দীন ১ম খন্ড ৩৪৩ পৃ.)।

দলিল নং- ১৯

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি আমার কবর (রওজা মোবারক) যিয়ারত করবে- তার জন্য আমার শাফায়াত অপরিহার্য হয়ে যাবে। (এহইয়ায়ে উলুমিদ্দীন ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.- ১২৭)

দলিল নং - ২০

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় মদিনাতে আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে। তার জন্য কিয়ামতের দিন আমি শাফায়াতকারী এবং সাক্ষীদাতা হব। (এহয়ায়ে উলুমিদ্দীন ৬ষ্ঠ খন্ড ১২৭ পৃ.)

দলিল নং- ২১

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করল- অত:পর আমার রওজা যিয়ারত করল- সে ঐ ব্যক্তির মত, যে আমার জীবিত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করল। (বায়হাকী- শুআবুল ঈমান- মিশকাতুল মাসাবীহ ১৪১ পৃ.)

দলিল নং - ২২

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশা ফরমান, যে ব্যক্তি সেচ্ছায় আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে- সে কিয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশীর মধ্যে শামিল হবে। অর্থাৎ, আমার অতি নিকটে আসবে। (বায়হাকী শুআবুল ঈমান, মিশকাতুল মাসাবীহ ১৪১ পৃষ্ঠা)

দলিল নং - ২৩

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করল অথচ আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করল না- সে আমার উপর জুলুম করল। (কামিল, শিফাউস সিকাম, শরহে লূবাব)।

টীকা : বিনা যিয়ারতে হজ্ব করলে হাজী হয় না- নবীজীর উপর যুলুমকারী পাঁজী হয়।

দলিল নং - ২৪

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে চলে গেলেন- তখন সেখানের সমস্ত জিনিস অন্ধকার হয়ে গেল। আর যখন মদিনায় পৌছলেন- তখন সেখানকার সমস্ত জিনিস আলোকিত হয়ে গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- মদীনায় আমার ঘর এবং সেখানেই আমার রওজা হবে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য যে, আমার রওজা মোবারক যিয়ারত করবে। (আবু দাউদ- ইত্তেহাফ)

টীকা ঃ ইহা নবীজীর ইলমে গায়েবের প্রমাণ। এম. এ জলিল।

দলিল নং- ২৫

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শহীদানে উহুদ সম্পর্কে বলেন, সেই খোদার কসম যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মাযারে এসে কেউ সালাম দিলে তারা পর্যন্ত তার সালামের প্রতি উত্তর দিতে থাকবেন। (বায়হাকী- মাওয়াহিবুল্লান্নিয়া ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৮৮)।

দলিল নং -২৬

হযরত নাফে' হযরত ইবনে ওমর (রা:) হতে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে ওমর (রা:) যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন- প্রথমে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতেন

www.sunnibarta.com

(নামায আদায় করতেন)। অত:পর কবরে মুকাদ্দাস অর্থাৎ (রওজা মোবারক যিয়ারত করতেন) অত:পর তিনজনকে সম্বোধন করে বলতেন। (মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৮)

হৃদয় প্রশান্তি

জিয়ারতে খানায়ে কা'বা ও মদিনা তাইয়্যেবা

সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

"তালাআল বাদরু আলাইনা মিনসানিয়াতিল বিদায়ে, ওয়াজবাশ্‌ শুকরো আলাইনা মা-দাআ লিল্লাহি দায়ী।"

কতইনা সৌভাগ্যবান মদিনার ঐ অধিবাসীগণ, যারা প্রানের উচ্ছ্বাসে সতঃস্ফূর্তভাবে দফ বাজিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। আজো আমরা উচ্ছ্বসিত হই তাঁদের সেই অভিবাদন সুরে। নিভৃতে করি আফসোস, হায় তাদেরই একজন যদি আমি হতে পারতাম। মুহুর্তেই খুঁজে নেই শান্তনা যে, তাঁদের একজন হতে পারিনি, কিন্তু তাতে কি! আমি তো সেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতরুপেই ধরার বুকে এসেছি। মেহেরবান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অন্য কোন নবীর উম্মত না করে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীর উম্মতরূপে ধরার বুকে প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয় তা আমাদের পরম সৌভাগ্য। নিজেকে আরো বেশী ধন্য মনে হয় যে আউলিয়াদের পূন্যভূমি সুজলা-সুফলা বাংলার জমিনে জন্ম নিয়েছি বলে। তাঁদের ত্যাগের বিনিময়েই আজ আমরা মুসলমান। নিজেদেরকে নবীর প্রেমিক মুসলমান বলে দাবী করতে পারছি। কেননা, আমরা আসিনি সেই সোনালী যুগে, স্বচক্ষে দেখিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু অলায়হি ওয়া সাল্লামকে। এমনকি দেখিনি কোন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কিবা কোন তাবে তাবেঈনকে। পবিত্র কালামে পাকে আছে, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সাদেকীনদের (অলীগনের) সঙ্গ লাভ কর।"(সুরা তাওবা-১১৯)

আল্লাহ পাক আরো বলেছেন, "হে ঈমানদারগন! তোমরা আনুগত্য কর রাসুলের আর তাঁদেরই যারা তোমাদের মধ্যে (দ্বীনি) হুকুমতের আসনে সমাসীন।! (সুরা নিসা-৫৯) উল্লেখিত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের এটাই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের পাশাপাশি যারা দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত থাকবেন তথা আহলে বায়াতে রাসুল, কামিল মুর্শিদ, হক্কানী ওলামায়ে কেরাম, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন ও আউলিয়ায়ে কামেলীনদের অনুসরণ করা। আর তাই আমরা আউলিয়াদের পদাংক অনুসরন করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসি। সিক্ত হতে চাই প্রিয় নবীজীর প্রেমে। আর রাসুল প্রেমিক মাত্রই হৃদয় টানে মদিনার পানে। আমি ও তার ব্যতিক্রম নই। কেননা, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার জিয়ারত করবে সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাক্ষাৎ করল। "সেই অভিপ্রায়ে ২৭-২-২০১৭ তারিখে জীবনে প্রথমবারের মত স্বামী-সন্তানসহ গেলাম পাসপোর্ট অফিসে। অতি নগন্য, হতদরিদ্র আমার মনের কোনে অনেকদিন ধরেই যে বাসনা লুকায়িত, শুধুই প্রানের মদিনার দর্শন। মহান রবের কৃপায় যেন তা পূর্ণ হয় সে আশাটুকুই অনুরণিত হচ্ছে হৃদয়কোণে বারবার- কত যে আকুতি প্রানের গহীনে, দেখিব মদিনা আপন নয়নে। প্রতীক্ষার প্রহর শেষে ২১-৩-২০১৭ তারিখে পেয়ে গেলাম পাসপোর্ট। প্রাথমিকভাবে মনটা খুবই প্রফুল্ল। অন্তর কেবলই নিভৃতে বলছে নিরন্তর-ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়া হাবীবাল্লাহ সাল্লালাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! নয়ন রয়েছে অপূর্ণ, কেবলই শুনেছি কিন্তু দেখিনি। দয়া করে দান করুন আমাদের হৃদয় প্রশান্তি এবং চক্ষুর শীতলতা। ২৪-৩-২০১৭ তারিখে জমা দিলাম পাসপোর্ট খোয়াই ট্রাভেলসে। শুরু হল প্রতীক্ষার প্রহর আর মনে মনে ভাবছি, ইয়া আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন, তোমার এই অধম গুনাহগার বান্দা যে কিছুই জানেনা, কিভাবে তোমার ঘর তাওয়াফ করতে হয়, কিভাবে তোমায় ডাকতে হয়, কিভাবে তোমার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করতে হয় কিছুই জানা নেই। ইয়া এলাহি পাক পরওয়ার, তুমি সর্বজ্ঞাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান। রহম কর হে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন, সহজ করে দাও আমাদের জন্য পবিত্র ওমরাহ ও প্রানের মদিনার জিয়ারত। মনের অন্দরে যখন এভাবে ঘুরপাক করছিলাম ঠিক তখনই খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম স্নেহের অনুজ

www.sunnibarta.com

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাহাদুরের দেয়া সৌজন্য কপি শহীদ মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকী (রহঃ) রচিত মাআ'রেফুল হারামাইন (মক্কা মদিনা পরিচিতি) বইখানা। খুশীতে মনটা ভরে গেল। কয়েকবার পড়ে নিলাম বইখানা। প্রিয় আত্মজা তাহসিন, তাজনীনকে বললাম, পড়। অনেক কিছু সহজে বুঝতে পারবে। এটা কেবল একটা বই-ই নয়, একজন রাহবারেরও কাজ করবে। যেটা লেখক নিজেও উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ পাক তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। ২৭-৪-২০১৭ তারিখে জানতে পারলাম আমাদের ফ্লাইট হবে ৪-৫-২০১৭ তারিখে। সংবাদ শুনামাত্রই যেন হয়ে গেলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি করব কি ঘুচাব কিছুই বুঝতে পারছিনা। কেবলই ভাবছি, সত্যিই কি আমরা ওমরাহতে যাচ্ছি! সত্যিই কি আমাদের নসীব হবে খানায়ে কা'বা ও মদিনা তাইয়্যেবার দর্শন। প্রানের নবীর প্রিয় জন্মস্থান মক্কা মোয়াজ্জমার দর্শনে ধন্য হবে মোর নয়ন, দেখব আমি গারে হেরা, আবে জমজম। ১-৫-২০১৭ তারিখে গেলাম আমাদের বাড়িতে। ক্ষনিকের তরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেননা, এই প্রথম নিজের বাবা-মা, ভাইদের ছেড়ে দেশের বাইরে যাচ্ছি। যাই হোক, বাবা-মায়ের দোয়া নিয়ে এসে গুছিয়ে নিলাম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। তিন তারিখ বাদ এশা বাড়ি হতে রওয়ানা হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। সাথে আছে প্রিয় ভাই মঈন ও স্নেহের বেলাল। আমাদের সফরসঙ্গী হিসাবে আছে আরো একটি পরিবার। প্রফেসর জনাব আব্দুল ওয়াহিদ তার স্ত্রী বেগম শামসুন্নাহার, তাদের দুই ছেলে এবং উনার শ্বশুড়। গাড়িতে উঠেই ছোট্ট তাবাসসুম গুনগুনিয়ে গাওয়া আরম্ভ করল, আশাকারীর মনের আশা আল্লাহ পূরণ করনা, একবার মদিনা দেখাওনা। গাইতে গাইতে কিছুক্ষন পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। প্রায় বারোটার দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম ঢাকা শাহজালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ওখান থেকে বিদায় নিল প্রিয় ভাই মঈন ও স্নেহের বেলাল। তারপর ইমিগ্রেশন শেষে ভোর চারটায় বিমানবন্দরেই আমরা ইহরাম পরে নিলাম। ছেলে সারওয়ার ও তার বাবাকে ইহরাম পরিধান অবস্থায় দেখে কি যে এক স্বর্গীয় অনুভূতি অনুভব করছিলাম তা ভাষায় বোঝাতে পারবনা। আর মনে মনে শুধু আল্লাহর রহমত কামনা করছিলাম। তালবিয়া পাঠ করছি আর অন্তর কেবলই বলছে, হে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন, সহজ করে দাও আমাদের জন্য পবিত্র ওমরাহ ও প্রানের মদিনার জিয়ারত। কবুল কর ইয়া এলাহি পাক পরওয়ার রাব্বুল আলামীন। প্লেন ছাড়ল ঠিক ছ'টা চল্লিশে।

সাত ঘন্টা পর জেদ্দা কিং আব্দুল আজিজ বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলাম। ওখানেও চেকিং করল। কিছুদুর এগিয়ে মোবাইলের দোকান দেখতে পেলাম। উনি বললেন সিম একটা কিনে আমাদের দরবার শরীফের ভক্ত আব্দুল কাদির ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। উনি গেলেন সিম কিনতে। দোকানী বলল, হবেনা নাম্বার নেই। তখন বুঝতে পারলাম যে আমার পাসপোর্টে টুকে দেওয়া নাম্বারটাই হয়তো সিম কেনার জন্য দিয়েছে। আমার পাসপোর্ট দেখালাম তখন আমাদেরকে সিমকার্ড দিল। বিনিময় ৩০ রিয়াল। সিমের নাম মোবাইলী, মেয়াদ পনের দিন। সিম ঢুকিয়ে মোবাইলটা একটু চার্জ করে নিলাম। উনি কথা বললেন আব্দুল কাদির ভাইয়ের সঙ্গে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। মনটা ব্যাকূল হয়ে আছে দেশে যোগাযোগ করে মেয়ে তাজনীনের এস এস সি রেজাল্ট জানার জন্য। বাড়িতে ফোন দিয়ে জানতে পারলাম তাজনীন পাশ করেছে ৪.৮৬ পেয়ে। খুব একটা খুশী হতে পারলামনা। আবারো ফোন দিলাম ছোট বোনের জামাই প্রফেসর মাওলানা জিয়াউল হক চৌধুরীকে। বললাম তাজনীনের রেজাল্টটা দেখে পুনঃ নিরীক্ষনের ব্যবস্থা করতে। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমি দেখব। গাড়ি করে এসে পৌঁছলাম মক্কাতে আমাদের হোটেল মানাযিল আল মুসাফিরে। হোটেলে পৌঁছে উনি আমাদের জন্য খাবার আনতে গেলেন। এরই মধ্যে চলে আসলেন আব্দুল কাদির ভাই। খাবার খেয়ে সবাই চলে গেলাম পবিত্র হারামাইন শরীফে। যাওয়ার পথে পেয়ে গেলাম আরেক ভাই আব্দুল হক ভাইকে। ততক্ষনে মাগরিব হয়ে গেছে। মাগরিব নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে বাদ এশা পবিত্র ওমরাহ সম্পন্ন করে নিলাম। আব্দুল হক ভাই, আব্দুল কাদির ভাই অনেক সহযোগিতা করলেন। আমার শ্বাশুড়ির শরীরের অবস্থা খুব একটা ভাল না থাকায় সায়ীর সময় উনার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করা হলো। ছোট্ট তাবাসসুমকেও তার দাদুর সাথে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। কিন্তু সে নারাজ, আমাদের সাথে দৌঁড়াবে। কাজেই তাকে নামিয়ে নিলাম

www.sunnibarta.com

আমাদের সাথে। কিছুক্ষন পর দেখি সে তার সম্মানীত বাবার পিঠে চড়ে সায়ী করছে। আমি বললাম, নামিয়ে দেন, আমি কোলে নিয়ে নেই। বললেন, না থাক। বিবি হাজেরা ও তো সন্তানস্নেহে দৌঁড়াদৌড়ি করছিলেন, তবে আমি কেন মেয়েকে পিঠে নিয়ে দৌঁড়াতে পারবনা। আসলে একেই বলে সন্তানস্নেহ। সায়ী শেষে সারওয়ারকে নিয়ে তার বাবা গেলেন মাথা মুন্ডন করতে আর আমাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন হোটেলে। ফিরে এসে আমাদের চুলের গোছা কেটে দিলেন। তারপর গোসল সেরে নিলাম সবাই। তিন তারিখ রাতে ঘুম নেই কারো চোখে। অনেকেই দেখছি প্লেনে ঘুমিয়েছেন। আমরাই মনে হয় কিছুটা ব্যতিক্রম। চার তারিখ জেদ্দা পৌঁছে চলে এলাম মক্কায়। তারপর সম্পন্ন করে নিলাম পবিত্র ওমরাহ। তারপর রাতের খাবার খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাওলানা মোস্তাক আহমেদ

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ যুবসেনা কেন্দ্রীয় কমিটি

আল হামদুল্লিলাহি রব্বীল আলামিন। আসসালাতু ওয়াসালামু আলা রাসুলিহিল কারিম ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিকি ওয়া সালল্লিম। সকল প্রসংশা আল্লাহ্ তাআলা জন্য। শান্তি বর্শিত হোক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের উপর। দেশের এই বন্যা বিপর্যায় আবার সামনে কুরবানি ও হজ্জ। এই বিষয়ে মুসলমান ভাইদের উদ্দেশে কিছু কথা। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন- সূরা নং-২, আয়াত নং-১৭৭

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎ কাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী কৃতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই ফরহেজগার। এই আয়াতে আল্লাহু পাক এরশাদ করেন যে শুধু নামাজ, রোজা পালন করলে কেও ইমানদার হয় না। সমাজে অনেক এতিম, গরিব, মিসকিন ও অভাবী রোগী তাদেরকে সাহায্য এবং তাদের পাশে থাকতে হবে তখন আপনি ফরেজগার হবেন। হাদিস শরীফে এসেছে হযরত যারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্নিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান, যে ব্যাক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেনা, আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করে না। (মেশকাত -৪৭৩০)। এই হাদিসের মাধ্যমে নবীজি আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে আমরা যেন সকল মানুষদের দয়া ও অনুগ্রহ করি। একদা মদিনায় দুর্বিক্ষ দেখাদিল। সে সময় কুরবানি সামনেও ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) হতে বর্নিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান যে, কেও যেন কুরবানির গোশত তিনদিনের অধিক না রাখে। (তিরমিজি-১৫১৫) এই কথার উদ্দেশ্য ছিল যে, কুরবানির গোশত যেন অবাভি, গরির, মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। পরের বছর যখন অবস্থার পরিবর্তন হলো, নবীজি এরশাদ ফরমালেন যে, হযরত বুরাদা (রাঃ) হতে বর্নিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমালেন যে, আমি তোমাদেরকে তিনদিনের পর গোশত খেতে নিষেদ করেছিলাম যেন স্বচ্ছল ব্যক্তিরা অসমার্থ ব্যক্তিদের উদারভাবে তা দান করতে পারে। এখন যা ইচ্ছা খাও, অন্যকে খায়াও এবং জমাকরে রাখতে পার। (তিরমিজি-১৫১৬)।

আমার এই বিষয় লেখার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের দেশ এখন বন্যায় বিপর্যস্ত। অনেকে একবেলা খাবার খেতে পারতেছেনা, রাত জাপনের জায়গা নাই। আবার সামনে কুরবানি। এই অবস্থায় আমরা আমাদের মুসলমান ভাইদের কাছে আকুল আবেদন করেতিছি আসুন আমরা, গরিব অভাবি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দারাই। হয়তো সকলের সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা আমাদের নাই। হয়তো আপনার কুরবানির এক টুকরা গোশতে তাদের একবেলা খাবার হবে। হয়তো আপনার কুরবানির চামড়ার টাকায় আবার বাসস্থান ফিরে পাবে তারা।

অতএব আপনার কুরবানির গোশতের একটি অংশ তাদেরকে দান করার চেষ্টা করবেন এবং সাথে সাথে আর্থিক সহায়তা করবেন। আল্লাহ ও রাসুলের ভালবাসা পাওয়া আমাদের সকলের কামনা। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের ভাল কাজের প্রতিদান দিক। আমিন।

কুরবাণির ইতিহাস

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ রজভী

কুরবান শব্দের ব্যাখ্যা

قربان (কুরবাণ) আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ- নৈকট্য। সান্নিধ্য। উৎসর্গ।[১] কুরবাণি বলা হয়, যে কোনো ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। পরিভাষিক অর্থে কুরবাণি বলতে আমরা বুঝি- নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি জিলহজ্ব মাসের নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, নিজ অর্থের বিনিময়ে ক্রয়কৃত পশু যবেহ করা।

কুরবাণি করবে কারা:

প্রত্যেক স্বাধীন নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী মুসলমানের উপর কুরবাণি ওয়াজিব। গ্রামের বাসিন্দা হোক বা শহরের বাসিন্দা হোক।[২] অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থান ব্যতিত যার নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা তৎসম নগদ অর্থ যার মালিকায় রয়েছে, তাকে বলা হয় মালে নিসাব।

উল্লেখ্য যে, সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের হিসেব অনুযায়ী সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য অনেক কম। সুতরাং যেসব মুসলমানের নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সমপরিমাণ অর্থ নেই, তাদের নিকট যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমপরিমাণ অর্থ থাকে, তখনও তার কুরবাণি ওয়াজিব।

কুর'আন শরিফে কুরবাণির কথা

নামায শেষে কুরবাণির নির্দেশ: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'আপনার প্রভুর নামে নামায পড়ুন এবং কুরবাণি করুন।'[৩]

কুর'আনে কুরবাণির ইতিহাস:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

'আর হে হাবিব! আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যখন তারা কুরবাণি করছিলো।'[৪]

সবার কুরবাণি কবুল হয় না:

فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

'উভয়ের মধ্যে একজনের কুরবাণি কবুল করা হলো, অপর জনের কুরবাণি কবুল করা হয়নি।'[৫]

শুধু মুত্তাকিদের কুরবাণি কবুল হয়:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মুত্তাকিদের পক্ষ থেকে (কুরবাণি) কবুল করেন।'[৬]

আল্লাহ্র নিকট কুরবাণি পশুর গোশত পৌঁছে না।

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

'আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কুবানির গোশত, রক্ত, কিছুই পৌঁছে না; কিন্তু তোমাদের খোদাভীতি ও পরহেজগারিতা পৌঁছে।'[৭]

কুরবাণি হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'আপনি বলুন! নিঃসন্দেহে আমার নামায, আমার কুরবাণিগুলো আমার জীবন-মরন সবই আল্লাহ্র জন্য যিনি রব সমগ্র জাহানের'[৮]

হাদিস শরিফে কুরবাণি

কুরবাণির পরিচিতি ও ফযিলত:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- : مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ؟ قَالَ :« سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ». قَالُوا : مَا لَنَا فِيهَا مِنَ الأَجْرِ؟ قَالَ :« بِكُلِّ قَطْرَةٍ حَسَنَةٌ

[১]. ড.ফজলুর রহমান: আল-মুজামুল ওয়াফী-৭৮৬ পৃ।

[২]. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি: মালাবুদ্দা মিনহু-(ফার্সি) ১৪৫ পৃ.

[৩]. সুরা কাওসার:আয়াত-০২

[৪]. সুরা মায়িদা: আয়াত-২৭

[৫]. সুরা মায়িদা: আয়াত-২৭

[৬]. সুরা হজ্ব: আয়াত-৩৭

[৭]. সুরা মায়িদা: আয়াত-২৮

[৮]. সুরা আন'আম-১৬২

www.sunnibarta.com

‘হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! কুরবাণি কী? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, কুরবাণি তোমাদের আদিপিতা হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম'র সুন্নাত। সাহাবাগণ পুণরায় আরজ করলেন, এই কুরবাণির মধ্যে আমাদের কী উপকারিতা রয়েছে? হুযুর ইরশাদ করেন- কুরবাণি পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি করে নেকি প্রদান করবেন। সাহাবাগণ আবারো জানতে চাইলেন, তাহলে দুম্বা ও ভেঁড়ার প্রতিটি পশমের বিনিময়েও কী সাওয়াব পাওয়া যাবে? নবিজি বলছেন. হ্যাঁ দুম্বা ও ভেঁড়ার প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে তোমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে।’[৯]

কুরবাণি কোথায় ওয়াজিব হয়েছিলোঃ

عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «أقام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ দশ বছর মদিনা শরিফে অবস্থান করেন। আর সেখানে প্রতি বছরই তিনি কুরবাণি আদায় করেন।’[১০]

নামাযের পূর্বে যবেহ করলে, পুণরায় যবেহ করতে হবেঃ

عَنْجُنْدَبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ يَقُولُ :« مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ

‘হযরত জুন্দব ইবনে সুফিয়ান বাযালি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবাণির দিন আমি হুযুর নাবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট হাযির হলাম। তিনি ইরশাদ করছেন, নামায পড়ার পূর্বে যে ব্যক্তি যবেহ করছে, সে যেনো তার স্থলে আরেকটি পশু কুরবাণি করে। আর যে ব্যক্তি যবেহ করেনি, সে যেনো যবেহ করে।’[১১]

কুরবাণির পশু কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবেঃ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فيطيبوا بها نفسا

‘নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, কুরবাণি দিবসে পশুর রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে, মানব সন্তানের কোনো আমল আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়তর নয়। আর কুরবাণির পশু কিয়ামতের দিন তার শিং, পশম ও খুরসহ উপস্থিত হবে। কুরবাণি পশুর রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ার পূর্বে আল্লাহ্‌র নিকট কবুলিয়তের মকামে পৌঁছে যায়। অতএব, তা সানন্দে আদায় করো।’[১২]

কুরবাণি গোশত জমা রাখা যাবে কিনাঃ

أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ قَالُوا هَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا فَقَالَ أَخِّرُوهُ لَا أَذُوقُهُ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ

[৯]. ইমাম বায়হাকিঃ সুনানি কুবরা-৯/২৬১। তিবরানিঃ মুজামুল কাবির-৫/১৯৭। ইবনে মাযাহঃ সুনানি ইবনে মাজাহ-২/১০৪৫। নিশাপুরিঃ মুসতাদরাক-৩/৪৬৬। ইমাম আহমদঃ মুসনাদ-৪/৩৬৮। খতিব তিবরিযিঃ মিশকাত-১/৩৩১ হাদিস নং-১৪৭৬, দারুল কুতুব ইলমিয়া, বয়রুত, লেবানান।

[১০]. ইমাম তিরমিযিঃ জামে তিরমিযিঃ ৪/৪৭ হাদিস নং-১৫০৭। সুনানি তিরমিযি-৩/৩২। ইমাম আহমদঃ মুসনাদ-২/৩৮। খতিব তিবরিযিঃ মিশকাত-১/৩৩১ হাদিস নং-১৪৭৫।

[১১]. ইমাম বুখারিঃ সহিহ বুখারি-২/২৩ হাদিস নং-৯৮৫। ইমাম আহমদঃ মুসনাদ-৩১/১১১ হাদিস নং-১৮৮১৫। তিবরানিঃমুজামুল কাবির-২/১৩২। ইমাম বায়হাকিঃ সুনানি কুবরা-৯/২৬২।

[১২]. হিন্দিঃ কানযুল উম্মাল-৫/১৪১ হাদিস নং-১২১৫৩। ইমাম বায়হাকিঃ শু'আবুল ইমান-৫/৪৮০। ইমাম তিরমিযিঃ সুনানি তিরমিযি-৪/৮৩। খতিব তিবরিযিঃ মিশকাতুল মাসাবিহ-১/৩৩০ হাদিস নং-১৪৭০।

www.sunnibarta.com

فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةَ وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ

'হযরত আবু সাঈদ খুদুরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বাড়ি ছিলেন না। একদিন বাড়ি ফিরলে তার সামনে গোশত আনা হলো। পরিবারের একজন বললেন, এটি আমাদের কুরবাণির গোশত। তিনি বললেন, এটা সরিয়ে নাও; আমি এর স্বাদ গ্রহণ করবো না। হযরত আবু সাঈদ খুদুরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তারপর আমি উঠে বের হয়ে গেলাম। পরে আমার ভাই হযরত আবু কাতাদাহ ইবনে নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট উপস্থিত হলাম। আবু কাতাদাহ মাতার দিক থেকে ভাই ও সম্মানিত বদরি সাহাবি ছিলেন। আমি তাঁর নিকট গোশতের ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তোমার পর নতুন নির্দেশ জারি হয়েছে।'[১৩]

অর্থাৎ- কুরবাণির গোশতকে তিনভাগ, ফকির মিসকিন। আত্মীয়-স্বজন। তাদেরগুলো যথাযত বন্টনের পর নিজেদের জন্য রেখে দেয়া অংশটি ইচ্ছেনুযায়ী রাখা যাবে।

সামর্থ থাকার পরও কুরবাণি না করলেঃ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- :« مَنْ وَجَدَ سَعَةً لأَنْ يُضَحِّىَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَحْضُرْ مُصَلاَّنَا

'হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, সামর্থ থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি কুরবাণি করে না। সে যেনো আমাদের ঈদগাহের ময়দানে না আসে।'[১৪]

প্রথম কুরবাণির ইতিহাসঃ

মহাগ্রন্থ কুর'আনের আয়াতে কারিমা থেকে জানা যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম কুর'বানি করছিলেন, হযরত আদাম আলায়হিস সালাম'র সন্তান হাবিল ও কাবিল। এ ব্যপারে মহান আল্লাহ্ রাসুলে কারিম হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে লক্ষ করে ইরশাদ করছেন-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

'আর হে হাবিব! আপনি তাদেরকে আদামের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনিয়ে দিন, যখন তারা কুরবাণি করছিলো।'[১৫]

এই আয়াতের তাফসিরে প্রায় সব মুফাসসিরিন কিরাম বর্ণনা করেছেন, হযরত আদাম আলায়হিস সালাম'র স্ত্রী হযরত হাওয়া আলায়হিস সালাম'র গর্ভে প্রতিবারে একজন পুত্র ও একজন কণ্যা জন্ম লাভ করতো। এভাবে বিশবারে তিনি মোট চল্লিশজন সন্তান তিনি প্রসব করেন। প্রথম জোড়া সন্তানের নাম, কাবিল ও আকলিমা। দ্বিতীয় জোড়া সন্তানের নাম, হাবিল ও লাবুদা[১৬]। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক পূর্ববর্তী কিতাবের বরাতে লিখেছেন- কাবিল ও আকলিমার জন্ম হয়েছিলো জান্নাতে। সেসময় হযরত হাওয়া আলায়হিস সালাম'র কোনো প্রসব বেদনা অনুভব হয়নি। নিফাসের কোনো রক্তও প্রবাহিত হয়নি। আর হাবিল ও লাবুদার জন্ম হয় দুনিয়াতে আসারপর। তখন থেকে প্রসবের সময় প্রচন্ডভাবে বেদনা ও নিফাসের রক্ত নির্গত হওয়া শুরু হয়।

হযরত আদাম আলায়হিস সালাম'র সেসব সন্তানদের উপযুক্ত বয়স হলে, একজোড়ের পুত্রকে অন্য জোড়ের কন্যার সাথে বিবাহ দিতেন। এ স্বাধীনতাও ছিলো যে, নিজের জোড়ের বোন ব্যতিত যে কোনো জোড়ের বোনকে বিবাহ করা বৈধ ছিলো। ভাগ্যক্রমে হাবিলের জোড়ের বোন লাবুদা দেখতে খুব বেশি সুন্দরী ছিলো না। যার দরুন, কাবিল অবৈধ জানার পরও নিজের জোড়া সুন্দরী বোন আকলিমাকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিলো। যুক্তি হিসেবে কাবিল বললো, আমাদের জন্ম

১৩. ইমাম বুখারিঃ সহিহ বুখারি-৭/১০৩ হাদিস নং-৫৫৬৮। ইমামনাসাইঃ সুনানি কুবরা-৩/৫৬ হাদিস নং-৪৫১৬।

১৪. ইমাম বায়হাকিঃ সুনানি কুবরা-৯/২৬০। নিশাপুরিঃ মুসতাদরাক-২/৪২২ হাদিস নং-৩৪৬৮। ইমাম সুয়ুতিঃ জামিউল আহাদিস-২১/৪৮৮। হিন্দিঃ কানযুল উম্মাল-৫/১৮২ হাদিস নং-১২২৬০।

১৫. সুরা মায়িদাঃ আয়াত-২৭

১৬. এই নাম নিয়ে কারো কারো দ্বিমত আছে। যেমন- সুরা মায়িদার ২৭ নং আয়াতের তাফসিরে হাকিমুল উম্মাত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী (ρ) 'লিওয়া' উল্লেখ করেছেন।

www.sunnibarta.com

হয়েছে জান্নাতে আর লাবুদার জন্ম হয়েছে দুনিয়াতে। সুতরাং আকলিমাকে বিবাহ করার একমাত্র হকদার আমিই।

হযরত আদাম আলায়হিস সালাম সন্তানকে যথেষ্ট বুঝালেন। কিন্তু কাবিল তা মানলো না। উভয়কে সিদ্ধান্ত দেয়া হলো, তোমরা কুরবাণি দাও। যার কুরবাণি আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে, সে আকলিমাকে বিবাহ করবে। দু'জনে কুরবাণি দেয়ার সিদ্ধান্ত হলেও কাবিল মনে মনে ভাবলো, কুরবাণি কবুল হোক বা না হোক আকলিমাকে আমিই বিয়ে করবো।

তখনকার কুরবাণির রীতি ছিলো ভিন্নতর। যার কুরবাণি কবুল হতো, আকাশ থেকে একপ্রকার শুভ্র আগুন এসে কুরবাণির বস্তুগুলো জ্বালিয়ে দিতো। যার কুরবাণি কবুল হতো না, তার বস্তুগুলো অক্ষত রয়ে যেতো।

হাবিল ছিলো, বকরির অধিকারী ও কাবিল ছিলো, কৃষক। উভয়ে বকরি ও কাবিল কৃষির উত্তম ফসলাদি নিয়ে কুরবাণি দেয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলো। নির্দিষ্ট জায়গার কুরবাণির বস্তুসামগ্রী রেখে আসলে, হাবিলের কুরবাণি কবুল হয়ে যায়; কাবিলের কুরবাণি কবুল হয়নি। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন-

فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ

'উভয়ের মধ্যে একজনের কুরবাণি কবুল করা হলো, অপর জনের কুরবাণি কবুল করা হয়নি।'[১৭]

এতে কাবিল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে হাবিলের প্রতি হিংসা জমতে থাকে। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর হযরত আদাম আলায়হিস সালাম হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা শরিফ গমন করেন। তিনি হজ্বে যাওয়ার সময় আসমান, যমিন ও পর্বত সমূহকে তাঁর সন্তানদেরকে দেখাশুনার দায়িত্ব দিতে চাইলে তারা দায়ভার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে কাবিলই গ্রহণ করে সেই দায়ভার। সুযোগ বুঝে কাবিল মারাত্মক হিংসার বশবর্তী হয়ে হাবিলকে লক্ষ করে-

قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ

'সে বললো, নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করবো'। [১৮] ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ হাবিলের কোনো অংশে কম ছিলো না। তবুও নিজের কোমলতা প্রকাশ করে বললেন-

قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

'অপরজন আল্লাহ্ মুত্তাকিদের কুরবাণি কবুল করেন।'[১৯] আবার বললেন-

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

'আমাকে হত্যা করার জন্যে তুমি হাত তুললেও; তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত প্রসারিত করবো না। নিশ্চয় আমি জগতসমূহের রব মহান আল্লাহ্ কে ভয় করি।'[২০] হাবিল শেষতকে আবারো বললেন-

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

'নিশ্চয় আমি চাই! তুমি আমার ও তোমার পাপেরভার বহন করে জাহান্নামি হও। এবং এটা জালিমদের কর্মফল।'[২১]

ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে কারো প্রতিশোধ নেয়া। অথবা পরস্পরের প্রতি ক্ষেপিয়ে যাওয়া মোটেও সমীচীন নয়। এসব আচার-আচরণের ফলে, অনৈতিকতা কখনো কমে না; বাড়ে। সে জন্যে হাবিল সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কাবিলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেননি। বরং ভদ্রতার সাথেই উত্তর দিলেন। কেননা, রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো মুসলমানকে হত্যা করা যেমন পাপ। হত্যার জন্য রাগ তুলে দেয়াও একইভাবে পাপ।[২২]

---

[১৭]. সুরা মায়িদাঃ আয়াত-২৭

[১৮]. সুরা মায়িদাঃ আয়াত-২৭

[১৯]. সুরা মায়িদাঃ আয়াত-২৭

[২০]. সুরা মায়িদাঃ আয়াত-২৮

[২১]. সুরা মায়িদাঃ আয়াত-২৯

[২২]. হাদিস শরিফে রয়েছে-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, তরবারি উঁচিয়ে দু মুসলিম মুখোমুখি হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দু'জনই জাহান্নামে যাবে। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম আরজ

www.sunnibarta.com

হযরত আদাম আলায়হিস সালাম হজ্ব থেকে আসার পর, একরাত হাবিল পশুপাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি করেন। তখন বাবা কাবিলকে বললেন, দেখোতো ওর আসতে এতো দেরি হচ্ছে কেনো? কাবিল গিয়ে চরণভূমিতে হাবিলকে দেখে বললো, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তোমার কুরবাণি কবুল হয়েছে; কিন্তু আমার কুরবাণি কবুল হয়নি। হাবিল বললেন, মহান আল্লাহ্ কেবল মুত্তাকিদের পক্ষ থেকে কুরবাণি কবুল করে থাকেন। কথাশুনে চটে গিয়ে কাবিল সাথে থাকা একটি লোহার টুকরো দিয়ে আঘাত করে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে দিলো। কাবিল ছিলো, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম খুনি। এ জন্য হাদিস শরিফে আছে-

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন- অন্যায়ভাবে যে ব্যক্তি নিহত হয়, তার খুনের একটি দায় হযরত আদাম অ প্রথম পুত্রের ঘাঁড়ে চাপে।'[২৩]

হাবিল শাহাদাতের স্থান:

হাবিল শাহাদাতের স্থান সম্পর্কে হাদিস শরিফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (M) ও হযরত ইবরাহিম নাখয়ি (ρ) থেকে হাফিয ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির তদীয়গ্রন্থ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বর্ণিত আছে-

وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم مشهورة بأنها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب فالله أعلم

'দামেশকের উত্তর সীমান্তে কাসিউন পাহাড় সন্নিকটে একটি বধ্যভূমি আছে বলে কথিত রয়েছে। ওই স্থানটিকে মাগারাতুদ দাম বলা হয়ে থাকে। কেননা, সেখানেই কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিলো। তবে তথ্যটি আহলে কিতাবদের থেকে সংগ্রীহিত। এর যথার্থতা সম্পর্কে আল্লাহ্ ই ভালো জানেন।'

অন্য বর্ণনায় রয়েছে-

الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير وقال إنه كان من الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وهابيل وأنه استحلف هابيل أن هذا دمه فحلف له وذكر أنه سأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء فأجابه إلى ذلك وصدقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس

'হাফিয ইবনে আসাকির (ρ) তাঁর গ্রন্থে আহমাদ ইবনে কাসিরের জীবনি উল্লেখ করেছেন। আহমাদ ইবনে কাসির একজন যথেষ্ট পূণ্যবান বান্দা ছিলেন। একদা তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বাকার ও ওমার (Λ)'সহ হাবিলকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি হাবিলকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানেই তার রক্তপাত হয়েছিলো কিনা। হাবিল শপথ করে স্বীকার করেছেন, এখানেই তার শাহাদাতের স্থান, তিনি আল্লাহ্র দরবারে এ বলেও দোয়া করছিলেন যে, স্থানটি যেনো দোয়া কবুলের জায়গা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই দোয়াটি মহান আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার এই কথার সমর্থন করে বলেন, হযরত আবু বাকার ও ওমার প্রতি বৃহস্পতিবার এই স্থানটি যিয়ারত করেন।'[২৪]

করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! হত্যাকারী জাহান্নামে যাওয়ার কারণটাতো বুঝলাম। কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ কী? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উত্তরে ফরমনা- সে তার সঙ্গীকে হত্যার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন- ইমাম বুখারি: সহিহ বুখারি শরিফ-১/১৫ হাদিস নং-৩১। ইমাম মুসলিম: সহিহ মুসলিম শরিফ-৪/২২১৩ হাদিস নং-২৮৮৮। ইমাম আবু দাউদ: সহিহ আবু দাউদ-২/৫০৪ হাদিস নং-৪২৬৮। ইমাম আহমদ: মুসনাদ-৩২/৩৬১ হাদিস নং-১৯৫৯০। ইমাম নাসাই: সুনানি নাসাই-৭/১৪২ হাদিস নং-৪১৩২।

২৩. ইমাম নাসাই: সুনানি নাসাই-৭/৯৪ হাদিস নং-৩৯৯৬। ইবনে হিব্বান: সহিহ-১৩/৩২১ হাদিস নং-৫৯৮৩। ইমাম ইবনে মাজাহ-ইবনে মাজাহ-৩/৪৭৩ হাদিস নং-২৬১৬। ইমাম বায়হাকি: ৮/১৫ হাদিস নং-১৫৬০২।

২৪. ইবনে কাসির: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১/৯৪ মাকতাবায়ে মা'রুফ, বয়রুত।

www.sunnibarta.com

হাবিল শাহাদাতের পরবর্তী ঘটনা

হাবিলের আগে কোনো মানুষের দাফন-কাফন হয়নি। কোনো মানুষ মরেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে হাবিল সর্বপ্রথম মৃত। তাকে নির্মমভাবে হত্যার পর কাবিল তার মরদেহ খোলা ময়দানে ফেলে রাখে। লাশ কী করবে কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না। কাবিল দেখছিলো, লাশ খাওয়ার জন্যে বিভিন্ন জীব-জন্তু আসছে। তখন সে একটি বস্তায় লাশ ভরে পিঠে নিয়ে লাগাতার চল্লিশদিন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে, এক বৎসর যাবত ঘুরতে লাগলো। এভাবে দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে লাশে পঁচন শুরু হলে, জীব-জন্তুরা আরো ভীড় জমে লাশ কবে ফেলে দেয়।

মহান আল্লাহ্ তখন দুটি কাক পাঠিয়ে দেন। কাবিলের চোখের সামনে কাক দুটি মারামারি করে একে অপরকে হত্যা করে ফেলে। জীবিত কাকটি ঠোঁট ও পায়ের নখদ্বারা গর্ত খুঁড়ে মৃত লাশটিকে দাফন করলো। এই ঘটনা থেকে কাবিল শিক্ষা নিলো, মৃত মানুষের দেহ ফুঁতে ফেলতে হয়; কবরে দাফন করতে হয়। কুর'আনুল কারিমে ঘটনাটি বর্ণিত হয় এভাবে-

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

'এরপর আল্লাহ্ পাক কাক পাঠালেন। সে মাটি খুচতে লাগলো। নিজ ভাইয়ের লাশ কীভাবে লুকাবে, সেপথ দেখিয়ে দিলো। সে বললো, হায়! আমি কী তবে এই কাকের মতোও হতে পারলাম না! নিজ ভাইয়ের লাশ লুকাবার পন্থাও বের করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত সে নিজের কৃতকর্মের জন্যে খুবই অনুতপ্ত হলো।'[২৫]

আল্লাহ্র নিকট কাবিলের মর্যাদা কাকের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তাই কাককে শিক্ষক ও কাবিলকে ছাত্র বানিয়েছেন।[২৬]

কাবিলের শাস্তি:কাবিলের শাস্তি সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (ρ) বর্ণনা করেছেন-

أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه إلى فخذه وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت تنكيلا به وتعجيلا لذنبه وبغيه وحسده لأخيه لأبويه

'কাবিল যেদিন তার ভাই হাবিলকে হত্যা করেছিলো, সেদিন নগদ নগদ তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। মাতা-পিতার অবাধ্যতা, ভাইয়ের প্রতি হিংসা ও পাপের শাস্তি হিসেবে তার পায়ের গোছাকে উরুর সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এবং তার মুখমন্ডলকে সূর্যমুখি করে দেয়া হয়। হাদিস শরিফে রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন-

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم

'পরকালের জন্য শাস্তি সঞ্চিত রাখার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাকে দুনিয়াতেও নগদ শাস্তি প্রদান করেন। শাসকের বিরুদ্ধাচরণ ও আত্মীয়তা ছিন্ন করার মতো এমন জঘণ্য অপরাধ আর নেই।'[২৭]

হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম'র কুরবাণি

আল্লাহ্র নবি হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলায়হিস সালাম'র কুরবাণি ইসলামের ইতিহাসে আরেক বিরল ঘটনা। প্রায় বার্ধক্য বয়সে জন্ম হওয়া আদরের সন্তান হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম'র বয়স যখন আনুমানিক তেরো। কারো কারো মতে, সাত। তখন খলিলুল্লাহ আলায়হিস সালাম'র প্রতি খোদার পক্ষ হতে মক্কা মো'আযযামায় জিলহজ্ব মাসের ঈদুল আযহার অষ্টম, নবম ও দশম তারিখ পরপর তিন রাত স্বপ্নের মাধ্যমে ইশারা হয় আদরের সেই সন্তানটিকে আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবাণি দিতে।'[২৮] কুর'আনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে-

---

[২৫]. সুরা মায়িদা: আয়াত-৩১

[২৬]. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি: তাফসিরে মাযহারি- ১খণ্ড, সুরা মায়িদা ৩১ নং আয়াতের তাফসির।

[২৭]. ইবনে কাসির: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-১/১১৯ দারুল হাদিস, কাহের থেকে প্রকাশিত।

[২৮]. মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নাঈমী: তাফসিরে নুরুল ইরফান-২/১২০৩ (বাংলা)

www.sunnibarta.com

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

'অত:পর ছেলের বয়স যখন কাজ করার উপযুক্ত হলেন, তখন ইবরাহিম আপন সন্তানকে বললেন, হে আমার আদরের সন্তান! আমি তোমাকে যবেহ করতে স্বপ্নে দেখেছি। এতে তোমার মতামত কী? পুত্র বললেন, শ্রদ্ধেয় পিতাজী! আপনি যে বিষয়ে নির্দেশিত হয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করুন। ইনশা আল্লাহ্ ! আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।'[২৯]

নবিদের স্বপ্ন। নিচক স্বপ্ন না; ওহি। হাদিস শরিফে রয়েছে-

قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

'হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ওবাদা ইবনে ওমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতে শুনেছি- নবিদের স্বপ্ন হলো, ওহি। অত:পর তিনি 'ইন্নি আরা ফিল মানামি আন্নি আযবাহুকা' আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।'[৩০]

স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম'র প্রতি এই নির্দেশনা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা। আল্লাহ্র নবি হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম সেই স্বপ্ন বাস্তয়নের লক্ষে বদ্ধপরিকর হয়ে আপন সন্তানের কাছে মনের কথাটি ব্যক্ত করলেন। তাতে নিরেট সম্মতি দিলেন আদরের সন্তান হযরত ইসমাঈলও। (নাউযুবিল্লাহ!) হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম সম্মতি না দিলেও যবেহের কাজে হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম দেরি করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন, যবেহ করা যেমন ইবাদাত; যবেহ হওয়াও ইবাদাত। সুতরাং যিনি যবেহ হবে তিনিও সেই মহান ইবাদাতে শরিক অংশ করুক। [৩১]

[২৯] সুরা আস-সাফফাত-১০২

[৩০]. ইমাম বুখারিঃ সহিহ বুখারি-১/১৭১ হাদিস নং-৮৫৯। হুমায়দিঃ মুসনাদ-১/২২৫ হাদিস নং-৪৭৪।

[৩১]. মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁনঃ তাফসিরে নুরুল ইরফান-২/১২০৩ (বাংলা)

শয়তানের প্ররোচনা ও তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ:

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'ব আহবার ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক স্বীয় রাভিগণের মাধ্যমে বর্ণনা করেন। হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম যখন পুত্র ইসমাঈল আলায়হিস সালাম কে যবেহ করার জন্য ইচ্ছে পোষণ করলেন। তখন শয়তান বললো- আজ যদি ইবরাহিমের পরিবারকে বিভ্রান্ত করতে না পারি, তাহলে আর কখনো কাউকে বিপথগামী করতে পারবো বলে মনে হয় না। এরপর শয়তান একজন মানুষের আকৃতিধারণ করে প্রথমে ইসমাঈল আলায়হিস সালাম'র মাতা হযরত হাজেরা আলায়হিস সালাম'র নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী জানো, ইবরাহিম তোমার পুত্রকে নিয়ে কোথায় গিয়েছেন? তিনি বললেন- এই পাহাড়ি পথে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য গিয়েছেন। শয়তান বললো, না আল্লাহ্র শপথ! ব্যপারটি এমন নয়; বরং ইবরাহিম গিয়েছে ইসমাঈলকে যবেহ করতে। হাজেরা বললেন, এমনটি কখনো হতে পারে না। কারণ তিনি তাকে প্রচন্ড ভালোবাসেন; নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালোবাসেন। শয়তান বললো, আল্লাহ্ পাক তাকে আপন পুত্র যবেহের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈলের মা বললেন, তার রব যদি তাকে পুত্র যবেহ করতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে এরচেয়ে উত্তম কথা আর নেই। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করুক, এটাই শ্রেয়।

শয়তান ওখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন, হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম'র নিকট। তখন তিনি বাবা ইবরাহিম আলায়হিস সালাম'র পেছন পেছনে হাঁটছিলেন। শয়তান তাঁকে বললো, হে বালক! তুমি কী তবে জানো, বাবা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, এই পাহাড় থেকে আমরা জ্বালানি কাঠ সরবরাহের জন্য যাচ্ছি। তখন শয়তান বললো, আল্লাহ্র শপথ! এরকম নয়, তিনি তোমাকে যবেহ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। ইসমাঈল বললেন, এমনটি কেনো তাহলে? শয়তান বললো, তোমাকে যবেহ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, তবে আরো ভালো কথা। আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য করতে গেলে আমি তাঁকে কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া সহায়তা করবো। সেখানেও শয়তান নিরাশ হলো।

www.sunnibarta.com

এবার গেলো সরাসরি হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম'র সামনে। বললো, শায়খ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বললেন, পাহাড়ি এই পথে বিশেষ কাজে যাচ্ছি। শয়তান বললো, আল্লাহ্‌র কসম! আমার ধারণা, শয়তান আপনাকে স্বপ্নযোগে এসে আপনার আদরের এই পুত্রকে যবেহ করতে নির্দেশ দিয়েছে। তার কথায় তাকে চিনতে পারলেন, ইবরাহিম। বললেন, হে খোদার দুশমন! তুই দুর হয়ে যা! আমি অবশ্যয় আমার রবের নির্দেশ পালন করবো। শয়তান রাগান্বিত হয়ে চলে যায় আপন গন্তব্যে।'[৩২]

হযরত আবু তোফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম'র সামনে যখন জামারাহে উকবায় শয়তান আসলো, তখন তিনি তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেছেন। ফসে সে পালিয়ে যায়। এরপর যখন তিনি জামারাহে উসতায় গেলেন, সেখানেও শয়তান উপস্থিত হলে, আবারো সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন। শয়তান ভয়ে পালিয়ে বাঁচে। সবশেষে যখন ইবরাহিম জামারাহে কুবরাতে উপস্থিত হলে, সেখানেও শয়তান। অত:পর তার দিকে আবারো মারলেন সাতটি কংকর। এবার ইবরাহিম আলায়হিস সালাম প্রভুর নির্দেশ পালনার্থে এগিয়ে গেলেন আপন কাজে।'[৩৩]

যবেহের দৃশ্যপট:

আল্লামা বাগাভী (ρ)'র বরাতে আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি (ρ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম আদরের সন্তান হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম কে বললেন, চলো! আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে কুরবাণি পেশ করি। ছুরি ও রশি নিয়ে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম স্বীয় বাবার সাথে চলছেন। হযরত পিতাজী তাঁকে পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। পুত্র পিতাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবা! কুরবাণির পশু কোথায়? জবাবে পিতা বললেন-

يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَفَانْظُرْ مَاذَا تَرَى

'হে আমার আদরের ছেলে! আমি স্বপ্নে তোমাকে যবেহ করতে দেখেছি।'[৩৪] বলো, এতে তোমার অভিমত কী? কথাটি শুনে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম প্রেমাবেগে চমকে গেলেন। বললেন-

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

'হে আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা! আপনি যা দেখেছেন, তাই করুন। আমাকে পরম ধৈর্যশীলদের সাথে পাবেন, ইনশা আল্লাহ্ !'[৩৫] অতপর সন্তানের সুন্দর অভিমতও পেয়ে হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম যবেহের জন্য শুয়ালেন। ইরশাদ হচ্ছে কুর'আনুল হাকিমে-'[৩৬]।

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

'যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো, এবং পুত্রকে কাত করে শায়িত করলো।'[৩৭] এই দৃশ্যপট ছিলো 'মিনা'র এক পাথরের নিকটে। বর্ণনাকারী বলেছেন- তখনও হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম ছিলেন একেবারে স্বাভাবিক। যবেহের পূর্বে পিতার প্রতি অসিয়তমূলক কিছু কথা বললেন, হে আমার পিতা! আমাকে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলুন। আমি যেনো খুব বেশি নাড়াচাড়া করতে না পারি। আপনার কাপড়া গুটিয়ে নিন, যেনো তা আমার রক্তে রঞ্জিত না হয়, সাওয়াবও যেনো কম না হয়। আমার মা ওসব দেখে যেনো অস্থিরতাবোধ না করেন। ছুরিটি ধারালো করে নিন, আর গলায় ছুরি চালাবেন খুবই দ্রুত, আমার মৃত্যু যেনো সহজ হয়; কেননা মৃত্যু বড়ো কঠিন বিষয়। যখন আপনি আমাকে যবেহের পর বাড়ি ফিরবেন, তখন আমার মাকে সালাম বলবেন। আর আমার জামা যদি নিয়ে যান, তবে মাকে দেখাবেন। ওটা আমার মায়ের জন্য একটা শান্তনার বস্তু হবে।

হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম বললেন, বাবা! আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে তুমি আমার জন্য বড়ো সাহায্যকারী। কথাটি বলে, পুত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

[৩২]. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি: তাফসিরে মাযহারি-১০/৩৬৪ (ইফা থেকে প্রকাশিত অনুবাদ)

[৩৩]. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি: তাফসিরে মাযহারি-১০/৩৬৫।

[৩৪]. সুরা আস-সাফফাত-১০২।

[৩৫]. সুরা আস-সাফফাত-১০২

[৩৬]. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি: তাফসিরে মাযহারি-১০/৩৬১-৩৬২ (ইফা থেকে প্রকাশিত)

[৩৭]. সুরা আস-সাফফাত-১০৩

www.sunnibarta.com

কাঁদতে কাঁদতে চুমুখান পুত্রের ললাটভরে। তারপর ছুরি চালাতে শুরু করলেন, পুত্রের গলায়। ধারালো ছুরি দিয়ে যবেহের বহুচেষ্টার পরেও ব্যর্থ হলেন, হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম। তখন কয়েকবার পাথরে ছুরিতে ধার দিলেন, কাজ হলো না তবুও। ইবনে জারির ও ইবনে আবি হাতিম হযরত সুদ্দি থেকে বর্ণনা করেছেন- ইবরাহিম আলায়হিস সালাম পুত্রের গলায় বারবার সজোরে ছুরি চালালেও ইসমাঈল আলায়হিস সালাম'র গলার একটি ক্ষুদ্র পশমও কাটা যাচ্ছিলো না। কেননা, তার ওই গলায় মহান আল্লাহ্ তামার তক্তি লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম বললেন, পিতাজী! আপনি আমাকে উপুড় করে দিন। আমার চেহারার প্রতি দৃষ্টি পড়লে আমার প্রতি আপনার মায়া-মমতা আরো বেড়ে যাবে, যা আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে। এছাড়াও ছুরির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়লে আমিও ঘাবড়ে যেতে পারি। হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম পুত্রের কথামতো কাজ করেও যবেহের কাজে ব্যর্থ হন। মহান পারওয়ার দিগারে আলাম ইসমাঈল আলায়হিস সালাম'র পরিবর্তে হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম'র মাধ্যমে জান্নাত থেকে দুম্বা পাঠিয়ে দিলেন।[৩৮] সাথে সাথে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে আওয়াজ ভেসে এলো। কুদরাতের ভাষায়-

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

'আর আমি তাকে আহবান করলাম, হে ইবরাহিম! তুমিতো স্বপ্নাদেশ সত্যি পালন করলে, এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণশীলদের পুরস্কৃত করি।'[৩৯]

তাকবিরে তাশরিকের ইতিবৃত্ত :

হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম কে যখন কুরবাণি দেয়ার জন্য হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলায়হিস সালাম প্রচন্ডভাবে ছুরি চালাচ্ছিলেন। সেসময় মহান আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম'র জান্নাত থেকে একটি দুম্বা নিয়ে রাওয়ানা দিলেন। ফিরিশতার মনে এই আশঙকা হচ্ছিলো যে, তিনি পৃথিবীতে আসার পূর্বেই কিনা যবেহের কাজ সম্পাদন হয়ে যায়। তাই তিনি আকাশ থেকে ' الله اكبر الله اكبر' ধ্বনী ধ্বনী দিতে দিতে আসতে থাকেন। হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম আওয়াজ শুনে উপরের দিকে তাকালে আল্লাহ্র ফিরিশতা জিবরাঈল আলায়হিস সালাম কে দুম্বা নিয়ে আসতে দেখে সানন্দে বলে উঠেন-

لااله الا الله والله اكبر (লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার)পিতার যবানে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম আচমকা তাওহিদের বাণীশুনে তিনিও বলে উঠেন- الله اكبر الله اكبر ولله الحمد (আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! ওয়া লিল্লাহিল হামদু)।

মহান আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন বান্দাগণের যবান থেকে উৎকলিত পবিত্র এই বাণীগুলো তিনি রাব্বুল আলামিন এতোই পছন্দ করলেন যে, জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ ফযর নামাযের পর থেকে ১৩ জিলহজ্ব আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামায আদায়কারী পুরুষগণ অন্তত একবার বড়ো আওয়াজে ও মহিলাগণ ছোটো আওয়াজে পাঠ করা ওয়াজিব।

হযরত ইসমাঈলআলায়হিস সালাম'র পরিবর্তে যবেহকৃত দুম্বাটির পরিচয় :

যে দুম্বাটি হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম'র পরিবর্তে যবেহ হয়েছিলো, কারো কারো মতে সেটির নাম, জুরায়র। পশুটি সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (Λ) বর্ণনা করেছেন- قَالَ: كَبْشٌ قَدْ رُعِيَ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا

'তিনি বলেছেন, ঐ দুম্বাটি জান্নাতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত চরে বেড়িয়ে ছিলো। তার শরিরে ছিলো, লাল বর্ণের পশম।'[৪০]

অপর বর্ণনায় আছে- 'যে দুম্বাটি হযরত ইবরাহিম আলায়হিস সালাম যবেহ করেছিলো, সেটি ছিলো সেই দুম্বা যা হযরত আদাম আলায়হিস সালাম'র ছেলে হাবিল কুরবাণি দিয়ে ছিলো।'[৪১]

---

৩৮. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি: তাফসিরে মাযহারি-১০/৩৬৩-৩৬৪ (ইফা থেকে প্রকাশিত)

৩৯. সুরা আস-সাফফাত: আয়াত-১০৪-১০৫

৪০. ইবনে কাসির: তাফসিরে ইবনে কাসির-৭/৩১। ইমাম সুয়ুতি: তাফসিরে দুররে মুনসুর-৭/১১৩। শাওকানি: তাফসিরে ফতহুল কাদির-৪/৪০৭।

৪১. কাযি সানাউল্লাহ পানিপথি: তাফসিরে মাযহারি-১০/৩৬৮ (ইফা থেকে প্রকাশিত)

www.sunnibarta.com